



[www.banglainternet.com](http://www.banglainternet.com)

represents

**JOLE DANGAYA**

A TRAVELOUGE

BY

**Dr. Syed Mujtaba Ali**

ডালে ডাঙায়

স্বদেশ প্রিয়তা

বাবা ফিরোজ,

ভ্রমণ-কাহিনী তুমি যেদিন প্রথম পড়তে শুরু করবে সেদিন খুব  
সম্ভব আমি গ্রহ-সূর্যে তারায়-তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে বড় মজার  
ভ্রমণ—তাকে টিকিট লাগে না, 'ভিজার'ও দরকার নেই। কিন্তু, হায়,  
সেখান থেকে ভ্রমণ-কাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি।  
ফেরবারও উপায় নেই।

তাই এই বেলাই এটা লিখে রাখছি।

শান্তিনিকেতন  
পৌষপার্বণ, ১৩৬৩

তোমার  
আবু



বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি সব সময়ই এক হলহুল ব্যাপার, তুমুল কাভ। তাতে দুটো জিনিস সকলেরই চোখে পড়ে; সে দুটো—ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি।

তোমাদের কারো কারো হয়তো ধারণা যে সায়েব-সুবোরা যাবতীয় কাজকর্ম সারা করে যতদূর সম্ভব চুপিসাড়ে আর আমরা চিংকারে চিংকারে পাড়ার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ না করে কিছুই করে উঠতে পারি নে। ধারণাটা যে খুব ভুল সে কথা আমি বলবো না। সিনেমায় নিশ্চয়ই দেখেছি, ইংরেজরা ব্যাঙ্ককুইট (ভোজ) খায় কি রকম কোনো প্রকারের শব্দ না করে। বাটলাররা নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে, ছুরিকাটার সামান্য একটু ঝুং ঠাং, কথাবার্তা হচ্ছে মৃদু গুঞ্জন, সব-কিছু অতিশয় পরিপাটি, ছিমছাম।

আর আমাদের দাওয়াতে, পাশ-পরবের ভোজে, যগির নেমস্তল্লে ?

তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে? বিশেষ করে এসব বিষয়ে আমার গুরু সুকুমার রায় যখন তাঁর অজর অমর বর্ণনা প্রাটিনামাক্সে রেখে দিয়ে গিয়েছেন। শোনোঃ

'এই দিকে এসে তবে লয়ে ভোজভাত  
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড!  
কেই কহে 'দৈ আন' কেই হাঁকে 'পুচি'  
কেই কঁদে শূন্য মুখে পাতাখানি মুছি।  
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে  
হাতাহাতি জুঁতাভুতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।  
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা  
অনাহারে কত ধারে হল প্রাপহত্যা।'

বলে কি! ভোজের নেমস্তল্লে অনাহারে প্রাপহত্যা! অলপাং না হলে বাঙালীর নেমস্তল্লে হতে যাবে কেন? পছন্দ না হলে যাও না ফার্মোতে। খাও না আলোনা, আধাসেদ্ধ গুয়োয়ের মুণ্ড কিংবা কিসের যেন ন্যাজ!

কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সময় সব শেয়ালের এক রা।

আমি ভেনিসে দাঁড়িয়ে ইটালির জাহাজ ছাড়তে দেখেছি—জাহাজে বন্দরে,

ডাঙায় জলে উভয় পক্ষের খালাসীরা মাকারনি-থোকো খাঁটি ইটালিয়ান; আমি মার্সেলসের বন্দরেও ঐ কর্ম দেখেছি—উভয় পক্ষের খালাসীরাই বাঙা-থোকো সরেস ফরাসিস্। আমি ভোতারে দাঁড়িয়ে ঐ প্রক্রিয়াই সতিশয় মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি—দু'পক্ষের বাদরগুলোই বীফষ্টেক-থোকো খাটশ-মুখো ইংরেজ; আর গঙ্গায়, গোয়ালন্দে, চাঁদপুরে, নারায়ণগঞ্জে যে কত শত বার এই লড়াই দেখেছি তার তো লেখাজোখা নেই। উভয় পক্ষে আমারই দেশতাই জাতভাই দাড়ি-দোলানো, লুষ্ঠি-ঝোলানো, সিলট্যা, নোয়াখাল্যা।

বন্দরে বন্দরে তখন যে চিংকার, অটরব ও হুঙ্কারধ্বনি ওঠে সে সর্বত্র একই প্রকারের। একই গঙ্গা, একই স্বাদ। চোখ বন্ধ করে বলতে পারবে না, নারায়ণগঞ্জে দাঁড়িয়ে চাঁটগাইয়া শুনছ, না হামবুর্গে জর্মন শুনছ।

ডেকে রেখিও ধরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় তোমার মনে এই ধারণা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, জাহাজ এবং ডাক্তার, উভয় পক্ষের খালাসীরা একমত হয়ে জাহাজটাকে ডাঙার দড়াদড়ির বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি দিতে চায়। কিন্তু ঐ তো মারাত্মক ভুল করলে, দাদা? আসলে দু'পক্ষের মতলব একটা খণ্ডযুদ্ধ লাগানো। জাহাজ ছাড়ানো-বীধানো নিছক একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে খালাসী জাহাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি তুর্কী ঘোড়ার তেজে ছুটছে, সে যে মাঝে মাঝে ডাঙার খালাসীর দিকে মুখ বিচিয়ে কি বলছে তার শব্দ সেই ধুকুমারের ভিতর শোনা যাচ্ছে না সতি। কিন্তু একটু কল্পনা শক্তি এবং দক্ষ খালাসী মনস্তত্ত্ব তোমার রক্ত থাকলে স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তার অতিশয় প্রাজ্ঞ বক্তব্য, 'ওরে ও গাড়ুগুন ইষ্টুপিড, দড়িটা যে বাঁ-দিকে গিট খেয়ে গিয়েছে, সেটা কি তোর চোখে মাংসুল গুঁজে দেখিয়ে দিতে হবে। ওরে ও'—(পুনরায় কটুবাক্য)।

এই মধুরসবাগীর জুতসই সদুত্তর যে ডাঙার কনে-পক্ষ চড়াকসে দিতে পারে না, সে কথা আদপেই ভেবো না। অবশ্য তারও গলা শুনতে পাবে না, শুধু দেখতে পাবে অতি রমণীয় মুখভঙ্গি কিংবা মুখ-বিকৃতি এবং বুঝতে হবে অনুমানে।

জাহাজের দিকে মুখ তুলে ফাঁচ করে খানিকটে থুথু ফেলে বললে, 'ওরে মকটিসা মকটি, তোর দিকটা ভালো করে জড়িয়ে নে না। জাহাজের টানে এ-দিকটা তো আপনার থেকে খুলে যাবে। একটা দড়ির মনের কথা জানিস নে আর এসেছিস জাহাজের কামে। তার চেয়ে দেশে গিয়ে ঠাকুরমার উকুন বাছতে পারিস নে? ওরে ও হামান-দিস্তের খাঁৎলামুখো'—(পুনরায় কটুবাক্য)।

একটুখানি কল্পনার সাবান হাতে থাকলে ঐ অবস্থায় বিস্তর বাস্তবের বুদ্ধি ভড়াতে পারবে।

ওদিকে এসব কলরব-মাইকেলের ভাবায় 'রথচক্র-ঘর্মর-কোদণ্ড-টঙ্কার' ছাপিয়ে উঠছে ঘন ঘন জাহাজের ভেঁপুর শব্দ—ভৌ, ভৌ, ভৌ, ভৌ—

তার অর্থ, যদি সে ছোট জাহাজের প্রতি হয়, 'ওরে ও ছোকরা, সর না। আমি যে এক্ষুণি ওদিকে আসছি দেখতে পাচ্ছিস নে? থাক! লাগলে যে সাড়ে বত্রিশভাঙা

হয়ে যাবি, তখন কি টুকরোগুলো জোড়া লাগাবি গাঁদাপাতার রস দিয়ে?' আর যদি তোমার জাহাজের চেয়ে বড় জাহাজ হয়, তবে তার অর্থ, 'এই যে, দাদা, নমস্কারম্। একটু বাঁ দিকে সরতে আজ্ঞা হয়, আমি তা হলে ডান দিকে সুড়ুং করে কেটে পড়তে পারি।' এবং এই ভেঁপু বাজানোর একটা তৃতীয় অর্থও আছে। প্রত্যেক জাহাজের মাঝিমাষ্টারা আপন ভেঁপুর শব্দ চেনে। কেউ যদি তখনো বন্দরের কোনো কোণে আনন্দরসে মগ্ন হয়ে থাকে, তবে ভেঁপুর শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ তার চৈতন্যোদয় হয় এবং জাহাজ ধরার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ছুট লাগায়।

আমি একবার একজন খালাসীকে সতীরে এসে জাহাজে উঠতে দেখেছি। তখন তার আর সব খালাসী ভাইয়ারা বা গালিগালাজ দিয়েছিল তা শুনে আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে বাপ বাপ করে সরে পড়েছিলুম। ইংরাজিতে বলে, 'হি ক্যান সুয়ার লাইক এ সেলার' অর্থাৎ খালাসীরা কটুবাক্য বলতে এ দুনিয়ার সব চাইতে ওস্তাদ। ওরা যে ভাষা ব্যবহার করে সেটা বর্জন করতে পারলে দেশ-বিদেশে তুমি মিষ্টভাষীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে পারবে।

তোমার যদি-ফাসী পড়নে-ওলা ক্লাসফ্রেন্ড থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করো, 'ইস্কন্দর-ই-ক্রমীরা পুরসীদ'—অর্থাৎ 'আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল'—দিয়ে যে গল্প আরম্ভ, তার গোটাটা কি? গরটা হচ্ছে, সিকন্দরশাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'তদতা আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বে-আদবদের কাছ থেকে?' 'সে কি প্রকারে সম্ভব?' 'তার' যা করে আমি তাই বর্জন করেছি।'।

খুব যে একটা দারুণ চালাক গল্প হল তা বলছি। তবে জাহাজের খালাসীদের—বিশেষ করে ইংরেজ খালাসীদের—ভাষাটা বর্জন করলেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

জাহাজের সিঁড়ি ওঠার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখবে দু-একটা লোক এক লাফে তিন ধাপ ডিঙাতে ডিঙাতে জাহাজে উঠছে। এরা কি একটু সময় করে আগে ভাগে আসতে পারে না? আসলে তা নয়। কোনো বেচারীকে কাপ্তানস হাউস (যারা আমদানী-রপ্তানী মালের উপর কড়া নজর রেখে মাংসুল তোলে) আটকে রেখেছিল, শেষ মুহূর্তে খালাস পেয়েছে, কেউ বা আধখন্টা আগে খবর পেয়েছে কোনো যাত্রী এ জাহাজে যাবে না বলে খালি বার্থটা সে পেয়ে গিয়েছে কিংবা কেউ শহর দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কোনো গতিকে এইমাত্র বন্দর আর জাহাজ খুঁজে পেয়েছে।

'বদর বদর' বলে জাহাজ বন্দরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

অজানা সমুদ্রের বুকে ভেসে যাওয়ার ঔৎসুক্য এক দিকে আছে, আবার ডাঙা থেকে ছুটি নেবার সময় মানুষের মন সব সময়ই একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে। অপর সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সীমার শেষের দিকলয়ের দিকে তাকিয়ে মুক্ত মনের যত অগাধ আনন্দই পাও না কেন, বাস্তবাবত্যের সঙ্গে দূরীর সংগ্রাম করে করে ক্ষণে-বাঁচা ক্ষণে মরার অতুলনীয় যত অভিজ্ঞতাই সম্বল কর না কেন,

মাটির কোলে ফিরে আসার মত মধুময় অভিজ্ঞতা অন্য কিছুতেই পাবে না। তাই ভ্রমণকারীদের গুরু, গুরুদেব বহু নদ-নদী সাগর-সমুদ্র উল্লীর্ণ হওয়ার পর বলেছেন,—

‘ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে

যে মাটি অচিল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।’

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

আমি জাহাজের পিছন দিকে রেলিঙের উপর ভর করে তাকিয়ে রইলুম আলোকমালায় সুসজ্জিত মহানগরীর—পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দরের দিকে। সেখানে রাস্তায় রাস্তায়, সমুদ্রের জাহাজে জাহাজে আর জেলেদের ডিঙিতে ডিঙিতে কোথাও বা সারে সারে প্রদীপশ্রেণী আর কোথাও বা এখানে একটা ওখানে দুটো, সেখানে একঝাঁক—যেন মাটির সাত-ভাই—চম্পা।

আমরা দেয়ালি জ্বালি বছরের মাত্র এক শুভদিনে। ওখানে সফৎসর দেয়ালির উৎসব। এদের প্রতিদিনের প্রতি গোঁধুলিতে শুভ লগ্ন। আর এদের এ উৎসব আমাদের চেয়ে কত সর্বজনীন! এতে সাড়া দেয় সর্ব ধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের নরনারী—হিন্দু—বৌদ্ধ—শিখ—জৈন—পারসিক—মুসলমান—খ্রীষ্টান।

আমি জানি, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কোনো কোনো ছোট্ট পাখির রঙ যে সবুজ তার কারণ সে যেন গাছের পাতার সঙ্গে নিজের রঙ মিশিয়ে দিয়ে পুকিয়ে থাকতে পারে, যাতে করে শিকারে পাখি তাকে দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে না নিয়ে যেতে পারে! তাই নাকি আমার রঙও কীচা বয়সে থেকে সবুজ—যাতে পাখি না দেখতে পায়, এবং পেকে গেলে হয়ে যায় লাল, যাতে করে পাখির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—যাতে সে যেন ঠুকরে ঠুকরে তাকে গাছ থেকে আলাদা করে দেয়, নিচে পড়ে তার আঁটি যেন নতুন গাছ গজাতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা ভুল, আমি বলি কি করে? বিজ্ঞানের আমি জানি কতটুকু, বুঝি কতখানি? কিন্তু আমার সরল সৌন্দর্য—তিয়াখী মন এসব জেনে—অনেক বলে, ‘না, পাখি যে সবুজ, সে শুধু তার নিজের সৌন্দর্য আর আমার চোখের আনন্দ বাড়ানোর জন্যে। এর ভিতর ছোট্ট হোক, বড় হোক, কোনো স্বার্থ লুকনো নেই। সৌন্দর্য শুধু সুন্দর হওয়ার জন্যই।’

ঠিক তেমনি আমি জানি, পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে প্রতি গোঁধুলিতে যে আলোর বান জেগে ওঠে, তার মধ্যে স্বার্থ লুকনো আছে। ঐ আলো দিয়ে মানুষ একে অন্যকে দেখতে পায়, বাপ ঐ আলোতে বাড়ি ফিরে, মা তার শিশুকে বুজে পায়, সবাই আপন আপন গৃহস্থালির কাজ করে; কিন্তু তবু, যখনই আমি দূরের থেকে ঐ আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনই মনে হয় এগুলো জ্বলানো হয়েছে শুধুমাত্র দেয়ালির উৎসবকে সফল করার জন্য। তার ভিতর যেন আর কোনো স্বার্থ নেই।

অকূল সমুদ্রে পথহারা নাবিক তারার আলোয় ফের পথ খুঁজে পায়। সেই স্বার্থের সত্য উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন,—

‘তুমি কত আলো জ্বালিয়েছ ঐ নগনে

কি উৎসবের লগনে।’

বন্দরের আলোর দিকে তাকিয়ে যদি আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে বলি,—

‘মোরা কত আলো জ্বালিয়েছি ঐ চরণে

কি আরতির লগনে।’

তবে কি বড় বেশী জ্বল বলা হবে?

অনেক দূরে চলে এসেছি। পাড়ের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। তবু এখনো দেখতে পাই হশ করে একখানা জেলে—ডিঙি আমাদের পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। আসলে কিন্তু সে হশ করে চলে যায়নি। সে ছিল দীড়িয়েই, কারণ তার গলুই সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে, আমরা তাকে পেরিয়ে গেলুম মাত্র।

আশ্চর্য, এত রাত অবধি পাড় থেকে এত দূরে তারা মাছ ধরছে!

এখন যদি বড় ওঠে তবে তারা করবে কি? নৌকা যদি ডুবে যায় তবে তারা তো এতখানি জ্বল পাড়ি দিয়ে ডাঙায় পৌছতে পারবে না। তবে তারা এ রকম বিপজ্জনক পেশা নিয়ে পড়ে থাকে কেন? লাভের আশায়? নিশ্চয় নয়। সে তত্ত্ব আমি বিলক্ষণ জানি। আমি একবার কয়েক মাসের জন্য মাদ্রাজের সমুদ্রপাড়ের আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। তারই পাশে ছিল, একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে এক জেলেপাড়া। আমি পাকা ছটি মাস ওদের জীবনযাত্রা—প্রণালী দেখেছি। ওদের দৈন্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমাদের পরীচ চাখীরাও এদের তুলনায় বড় লোক, এমন কি, আমাদের আদিবাসীরা, সাঁওতাল ভীলরাও এদের চেয়ে অনেক বেশী সুখস্বচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে। তোমাদের ভিতর যারা পুরীর জেলেদের দেখেছ তারাই আমার কথায় সায় দেবে।

তবে কি এরা অন্য কোনো সুযোগ পায় না বলে এই বিপদসঙ্কুল, কঠিন অস্বচ্ছ দুঃখের জীবন নিয়ে পড়ে থাকে? আমার এই মাদ্রাজী বন্ধু বলেন, তা নয়, এরা নাকি খোলা সমুদ্র এত ভালোবাসে যে তাকে ছেড়ে মাঠের কাজে যেতে কিছুতেই রাজী হয় না। ঝড়ের সময় মাছ ধরা প্রায় অসম্ভব বলে তখন উপোস করে দিন কাটাবে, ক্ষুধায় প্রাণ অতিষ্ঠ হলে, তুখা কাছাবাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না পারলে সেই ঝড়েই বেরয় মাছ ধরতে আর ডুবে মরে সমুদ্রের অঁঠে জলে।—তবু জ্বল ছেড়ে ডাঙার ধান্নায় যেতে রাজী হয় না।

এবং নৌকের মাঝি-মাষ্টা, জাহাজের খালসীদের বেলাও তাই। এদের জীবন এতখানি অতিশক্ত নয়, জানি, কিন্তু এরাও ডাঙায় ফিরে যেতে রাজী হয় না। এমন কি, যে চাখা সাত শ পুরুষ ধরে ক্ষেতের কাজ করেছে, সেও যদি দুর্ভিক্ষের সময় দু’পরসা কামাবার জন্য সমুদ্রে যায় তবে কিছুদিন পরই তাকে আর ডাঙার কাজে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর পুরনো খালসীদের তো কথাই নেই। গৌপদাড়ি পেকে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জ্বল আর নোনা হাওয়ায় চামড়ার রঙটি রোনজের মত হয়ে গিয়েছে, আর কদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই, জাহাজে কেউ চাকরি দিতে চায় না, তবু পড়ে থাকবে খিদিরপুরের এক ঘিঞ্জি আড্ডায় আর উদরান্ত এ—জাহাজ ও—জাহাজ করে করে বেড়াবে চাকরির সন্ধানে। ওদিকে বেশ দু’পরসা জমিয়েছে। ইচ্ছে করলেই দেশের গায়ের তেঁতুল গাছতলায় নাতি

নাতনীরা পাখার হাওয়া খেতে খেতে গল্প টপ বলাতে বলাতে দুটি চোখ বুজতে পারে।

সমুদ্রের প্রতি এদের কেমন যেন একটা 'নেশা' আছে, সে সম্বন্ধে তারা একটু লজ্জিত। কেন, জানিনে। তুমি যদি বলো, 'তা, চৌধুরীর পো'—চৌধুরীর পো বলে সম্বোধন করলে ওরা বড় খুশী হয়—'দু-পয়সা তো কমিয়েছ, আর কেন এ-জাহাজে ও-জাহাজে বকমারির কাজ করা। তার চেয়ে দেশে গিয়ে আট্টা-রসুলের নাম স্মরণ কর, আবেগের কথা ভাববার সময় কি এখনো আসে নি?'

বড় কাচুমাচু হয়ে বুড়ো বলবে, 'না, ঠাকুর, তা নয়।' দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলবে, 'আর দুটি বছর কাম করলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে। দু-পয়সা না নিয়ে নাতি-নাতনীদের ঘাড়ে চাপতে লজ্জা করে।'।

একদম বাজে কথা। বুড়ো জাহাজের কামে ঢোকে যখন তার বয়স আঠারো। আজ সে সত্তর। এই বাহান্ন বৎসর ধরে সে দেশে টাকা পাঠিয়েছে ভালো করে ঘর-বাড়ি বানাবার জন্য, জমি-জমা কেনার জন্য। এখন তার পরিবারের এত সচ্ছল অবস্থা যে ওরা জমিদারকে পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। আর বুড়ো বলে কিনা ব্যাটা-ভাইপো নাতি-নাতনী তাকে দু-মুঠো অন্ন খেতে দেবে না।

সমুদ্রের প্রতি কোনো কোনো জাহাজ-কাণ্ডেনের এত মায়ী যে বুড়ো কয়সে তারা বাড়ি বানায় ঠিক সমুদ্রের পাড়ে, এবং বাড়িটার চপও কিছুতকিমাকার। দেখতে আদর্শই বাড়ির মত নয়, একদম হবহ জাহাজের মতো—অবশ্য মাটির সঙ্গে যোগ রেখে যতখানি সম্ভব। আর তারই চিলেকোঠায় সাজিয়ে রাখে, কম্পাস, দূরবীন, ম্যাপ, জাহাজের স্টয়ারিঙ হুইল এবং জাহাজ চালাবার অন্যান্য যাকতীয় সরঞ্জাম। বাড়ির আর কাউকে বুড়ো সেখানে ঢুকতে দেয় না—যুনিফর্ম পরা না থাকলে জাহাজের ও জায়গায় তো কাউকে যেতে দেওয়া হয় না—এবং সে সেখানে পাইপটা কামড়ে ধরে সমস্ত দিন বিড়বিড় করে 'খালাসীদের' বকাঝকা করে। ঝড়বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। তখন সে একাই একশ। 'জাহাজ' বাঁচাবার জন্য সে তখন স্বেশে গিয়ে 'রিজ'ময় দাবড়ে বেড়ায়, 'টেলিফোনে' চিৎকার করে 'এক্সিন-ঘরকে' হুকুম হীকে, 'আরো জলদি, পুরো স্পীডে', কখনো বা বরষাতিটা গায়ে চাপিয়ে 'রিজ' খুলে 'ডেকের' তদারকি করে ডিঙ্গে কাঁই হয়ে ফের 'রিজে' ঢুকবে। ঝড় না থামা পর্যন্ত তার দম ফেলার ফুরসত নেই, ঘুমুতে যাবার তো কথাই ওঠে না। ঝড় থামলে হীক্ষ ছেড়ে বলবে, 'ওঃ, কি বাঁচনটাই না বেঁচে গিয়েছি। আমি না থাকলে সব ব্যাটা আজ ডুবে মরতো। আজকালকার চৌড়ারা জাহাজ চালাবার কিস-সু-টি জানে না' তারপর টেবিলে বসে আঁকাবীকা অঙ্করে 'জাহাজের ক্রু'দের ধন্যবাদ জানাবে, তারা যে তার হুকুম তামিল করে জাহাজ বাঁচাতে পেরেছে তার জন্য। তারপর ঝড়ের থাকায় জাহাজ যে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার 'বেয়ারিঙ' নেবে বিস্তার ল্যাটটিউড-লংগিটিউড করে এবং শেষটায় হীটু গেড়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে হাই তুলতে তুলতে আপন 'কেবিনে' শুতে যাবে।

তিন দিন পরে গুম গুম করে 'জাহাজ' থেকে নেমে সে পাড়ার অভডায় যাবে গল্প করতে—'জাহাজ' বললে এসে ভিড়েছে কি না। সেখানে সেই মারাত্মক ঝড়ের একটা ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়ে শেষটায় পাইপ কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'আর না, এই আমার শেষ সফর। বুড়ো হ্যাঁড়ে আর জলঝড় নয় না।' সবাই হা-হা করে বলবে, 'সে কি, কাণ্ডেন, আপনার আর তেমন কি বয়স হল?' কাণ্ডেনও 'হেঁ-হেঁ' করে মহাখুশী হয়ে 'জাহাজে' ফিরবে।

আমি আরো দুই শ্রেণীর লোককে চিনি যারা কিছুতেই বাসা বাঁধতে চায় না।

দেশ-বিদেশে আমি কিস্তর বেদে দেখেছি। এরা আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু আরো দূরে, অন্য কোথাও। কখন কোন্ জায়গায় কোন্ মেলা শুরু হবে, কখন শেষ হবে, সব তাদের জানা! মেলায় মেলায় গিয়ে কেনা-কাটা করবে, নাচ দেখাবে, গান শোনাবে, হাত শুনবে, কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বেলী দিন থাকবে না। গ্রীষ্মের বরদাহ, বর্ষার অবিরল বৃষ্টি সব মাথায় করে চলেছে তো চলেছে, কিসের নেশায় কেউ বলতে পারে না। বাক্যদের লেখা-পড়া শেখাবার চাড়া নেই, তাদের অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যিও তোয়াক্বা করে না। যা হবার হোক, বাসা তারা কিছুতেই বাঁধবে না। 'বাড়ির মায়ী কি তারা কখনো জানে নি, কোনো দিন জানবেও না।'

ইলভ দু'শ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে এদের কোনো জায়গায় পাকাপাকি ভাবে বসিয়ে দিতে। টাকা-পয়সা দিয়েছে, কিন্তু না, না, না, এরা কিছুতেই কোনো জায়গায় কেনা গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। ইলভ যে এখনো তার দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা পুরো একশ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ এই বেদেরা। এরা তো আর কোনো জায়গায় বেলী দিন টিকে থাকে না যে এদের বাকারা ইচ্ছুক যাবে? শেষটায় ইংরেজ এদের জন্য ড্রামামাগ পাঠশালা খুলেছে, অর্থাৎ পাঠশালার মাষ্টার শেলেট পেলিল নিয়ে ভবঘুরে হয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া লাগাচ্ছে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, তারা যেমন ছিল তেমনি আছে।

খোশা-মেলার সন্তান এরা—গণ্ডীর ভিতর বন্ধ হতে চায় না।

কিন্তু এদের সবাইকে হার মানায় কারা জানো?

রবীন্দ্রনাথ যাদের সম্বন্ধে বলেছেন,

'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন

চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।'

এই যে আরব-সাগর পাড়ি দিয়ে আদন বন্দরের দিকে যাচ্ছি এরা সেই দেশের লোক। সৃষ্টির আদিম প্রভাত থেকে এরা আরবের এই মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছে। এরা এদিক-ওদিক যেতে যেতে কখনো ইরানের সচ্ছল উপত্যকার কাছে এসে পৌছেছে কখনো লেবাননের ঘন বনমর্মরস্রনিও শুনতে পেয়েছে কিন্তু এসব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করার কণামাত্র লোভ এদের কখনো হয় নি। বরঞ্চ মরুভূমির এক মরুদ্যান থেকে আরেক মরুদ্যান যাবার পথে

সমস্ত ক্যারিভিয়ান (দল) জলের অভাবে মারা গেল—এ বীভৎস সত্য তাদের কাছে অজানা নয়, তবু তারা ঐ পথ ধরেই চলবে, কোনো জায়গায় স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাব তাদের মাথায় বজ্রাঘাতের ন্যায়।

জানি, এক কালে আরব দেশ বড় গরীব ছিল, কৃত্রিম উপায়ে জলের ব্যবস্থা করতে পারতো না বলে সেখানে চাষ-আবাদের কোন প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু হাশে নজ্জদ-হিজাজের রাজা ইবনে সউদ<sup>১</sup> পেট্রোল বিক্রি করে মার্কিনদের কাছ থেকে এত কোটি কোটি ডলার পেয়েছেন যে সে কড়ি কি করে খরচা করবেন তার কোনো উপায়ই খুঁজে পাননি না। শেষটায় মেশা যন্ত্রপাতি কিনে তিনি বিস্তর জায়গায় জল সেঁচে সেগুলোকে খেত-খামারের জন্য তৈরী করে বেদুইনদের বললেন, তারা যেন মরুভূমির প্রাণঘাতী বায়বরবৃষ্টি ছেড়ে দিয়ে এসব জায়গায় বাড়িঘর বাঁধে।

করে গোয়াল, কে দেয় দুনা!

সে সব জায়গায় এখন ভাল পাছের মত উঁচু আগাছা গজাচ্ছে।

বেদুইন তার উট-বছর, গাধা-ঘোড়া নিয়ে আগের মতই এবানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। উটের লোমের তাঁবুর ভিতর ব্রাহ্মবাস করে। ভ্রমণে যখন প্রাণ কষ্টাগত হয় তখন তার প্রিয় উটের কণ্ঠ কেটে তারই ভিতরকার জমানো জল খায়। শেষটায় জলের অভাবে গাধা-বছর, বউ-বাস্তাসহ গুটীসুজ্জ মারা যায়।

তবু 'পা-জমিয়ে' কোথাও নীড় বানাবে না।

এই সব তত্ত্বচিত্রায় মশগুল হয়েছিলুম এমন সময় হঠ করে আরেকখানা জেলে-নৌকা পাশ দিয়ে চলে গেল। দেখি, ক্যারিসের হুইয়ের নীচে লোহার উনুন জ্বলে বুড়ো রান্না চাণিয়েছে। কখনো কি না বলতে পারবো না, মনে হল ফোড়নের গন্ধ যেন নাকে এসে পৌঁছল। কখনো হোক আর যাই হোক তত্ত্বচিত্রা লোপ পেয়ে তন্দ্রাওই ক্ষুধার উদ্দেক হল।

ওদিকে কবে শেষ ব্যাচের শেষ ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, তত্ত্বচিত্রায় মনোবীক্ষণ বিলক্ষণ সুখনীয় প্রচেষ্টা কিন্তু ভ্রমণ-ডিভিউ উপেক্ষা করা সর্বাত্মক অব্যাহতির লক্ষণ।

তবু দেখি, যদি কিছু জোটে, না হলে পেটে কিল মেরে শুয়ে পড়বো আর কি।

দশ পা যেতে না যেতেই দেখি আমার দুই তরুণ বন্ধু পল আর পার্সি 'রামি' খেলছে। আমাকে দেখে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'গুড ইভনিং, স্যার!'

আমি বললুম, 'হ্যালো', অর্থাৎ 'এই যে।'

তারপর ঈক্ষু অভিমানের সুরে বললুম, 'আমাকে একলা ফেলে তাস খেলছে! যে বড়! জানো তাস ব্যাসন-বিশেষ, তাসে অযথা কালক্ষয় হয়, গুণীরা বলেন—'

ওরা বীধা দিচ্ছে না বলে আমাকেই খামতে হল।

পার্সি বললে, 'যথার্থ বলেছেন, স্যার।'

পল বললেন, 'হক কথা। কিন্তু স্যার, আমরা তো এতক্ষণ আপনার ডিনার যোগাড় করে কেবিনে গুছিয়ে রাখাতে—'

আমি বললুম, 'সে কি হে?'

পার্সি বললে, 'আজ্ঞে। যখন দেখলুম, আপনি ডিনারের ঘট্টা শুনেও উঠলেন না, তখনই আমরা ব্যবস্থাটা করে ফেললুম।'

সোনার চাঁদ ছেলেরা। ইচ্ছে হচ্ছিল দু'জনকে দু-বগলে নিয়ে উল্লাসে নাগা-নৃত্য জুড়ে দি। কিন্তু বয়সে কম হলে হবে কি, ওজনের দিকদিয়ে ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশী ভারি কি মুকুখি। বাসনাটা তই বিকাশ লাভ করলো না। বললুম, 'তবে চলো, বাদাস, কেবিনে।'

২

'গড্ডালিকা-প্রবাহে' অর্থাৎ ভিড়ের সঙ্গে মানুষ গা ভাসিয়ে দেয় কেন? তাতে সুবিধে এই;—আর পাঁচজনের যা গতি, তোমারও তাই হবে। এবং সেহেতু সংসারের আর পাঁচজন হোসে-খেলে বেঁচে আছে, অতএব ভূমিও দিবা তাদেরই মত সুখে-দুঃখে বেঁচে থাকবে।

আর যদি গড্ডালিকার না মিশে একলা পথে চলো তবে যেমন হঠাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যেতে পারো ঠিক তেমনি মোড় ফিরতেই আচমকা হয়তো দেখতে পাবে, ব্যাঘচাৰ্য বৃহদ্রাক্ষল থাবা পেতে সামনে বসে ন্যাক্স আছড়াচ্ছেন!

গুপ্তধনটা একা পেয়েছিল বলে সেটা যেমন তোমার একারই, ঠিক তেমনি বাঘের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে একাই।

তাই বেশীর ভাগ লোক সর্বনাশা ক্ষতির ভয়ে অত্যধিক লাভের লোভ না করে গড্ডালিকার সঙ্গে মিশে যায়।

জাহাজেও তাই। ভূমি যদি আর পাঁচজনের সঙ্গে ঘুম থেকে জাগে তবে সেই ভিড়ে তুমি ঝটপট তোমার 'বেড-টী'র কাপটি পাবে না। আর যদি খুব সকাল সকাল কিংবা আর সকলের চেয়ে দেরিতে ওঠো তবে চাশ্টি পেয়ে যাবে তনুহুতেই, কিন্তু আবার কোনো দিন দেখবে, তখনো আগুন জ্বালা হয়নি বলে চায়ের অনেক দেরি কিংবা, এত দেরিতে উঠেছো যে, 'বেড-টী'র পাট উঠে গিয়ে তখন 'বেক ফাস্ট' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বলে তোমার 'বেড-টী' হয় মাঠে, নয় দরিয়ায় মারা গিয়েছে।

ইংরিজিতে একেই বলে, 'নো রিস্ক, নো গেন' অর্থাৎ একটুখানি ঝুঁকি যদি নিতে রাজী না হও তবে লাভও হবে না। লটারি জিততে হলে অন্তত একটা টিকিট কেনার রিস্ক নিতে হয়।

সেদিন ঝুঁকিটা নিয়ে সুবিধে হল না। চা-টা মিস্ করে বিরসবদনে ডেকে এসে বসলুম।

১। এর ছেলে সম্প্রতি করাচীতে বেড়াতে এসেছিলেন।



এক মিনিটের ভিতর পল আর পার্সির উদয়।

পল ফিসফিস করে কানে কানে বললো, 'নতুন সব 'বার্ডি'দের (অর্থাৎ 'চিড়িয়াদের') দেখেছেন, স্যার?'

এরা সব নবাগত যাত্রী। কলম্বোয় জাহাজ ধরেছে। বেচারীরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডেকে-চেয়ার পাতবার ভালো জায়গার সন্ধানে। কিন্তু পাবে কোথায়? আমরা যে আগে-ভাগেই সব জায়গা দখল করে আসন-জমীন জমিয়ে বসে আছি—মাদার্স থেকে।

এ তো দুনিয়ার সর্বত্র হামেশাই হচ্ছে। মিটিঙে, ফুটবলের মাঠে সর্বদাই আগে গিয়ে ভালো জায়গা দখল করার চেষ্টা সবাই করে থাকে। এমন কি রান্নাঘরের দণ্ডায় বসে ঠিক দরজাটির কাছে। মা রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে বেরিয়েই সন্ধলের পয়লা দেবে আমাদের।

ভালো জায়গায় বসতে পারতে দুটো সুখ। একটা ভালো জায়গা পেয়েছে বলে এবং দ্বিতীয়টা তার চেয়েও বড়। বেশ আরাম করে বসে চিনে-বাদাম খেতে খেতে অলস নিরাসক্ত ভাবে ভাবিয়ে দেখতে, অন্যেরা ফ্যা-ফ্যা করে কি ভাবে ভালো জায়গার সন্ধানে ঘুরে মরছে। পরিচিত এবং অপরিচিত লোক হলে তো কথাই নেই। 'এই যে, ভড় মশাই জায়গা পাচ্ছেন না বুড়ি?' বলে ফিক করে একটুখানি সদুপদেশ বিতরণ করবে, 'কেন, ঐ দিকে তো মেলা জায়গা রয়েছে', বলে হাতখানা মাথার উপর তুলে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে দেবে। তার থেকে কেউই বুঝতে পারবে না, কোন দিকে জায়গা খালি। লোকটা দৃষ্টি দিয়ে বিষবৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে গজরাতে গজরাতে তোমার দৃষ্টির আড়াল হবে।

আঃ! এ সংসারে ভগবান তার অসীম করুণায় আমাদের জন্যে কত আনন্দই না রেখেছেন। কে বলে সংসার মায়াময় অনিত্য? সে বোধ হয় ফুটবলের মাঠে কখনো ভালো সীট পায়নি।

আমি পল-পার্সিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'অদ্যকার প্রোগ্রাম কি?'

পল বললে, 'প্রথমত, জিমনাস্টিক-হলে গমন।'

'সেখানকার কর্ম তালিকা কি?'

'একটুখানি রোইং করবো।'

'রোইং? সেখানে কি নৌকো, বৈঠে, জল আছে?'

'সব আছে, শুধু জল নেই।'

'?'

'বৈঠেগুলোর সঙ্গে এমন ভাবে স্প্রিং লাগানো আছে যে জল থাকলে বৈঠাকে যতখানি বাধা দিত স্প্রিং ঠিক ততখানি দেয়। কাজেই শুকনোয় বসে বৈঠে চালানোর প্র্যাকটিস আর পরিশ্রম দুই-ই হয়।'

আমি বললুম, 'উঁহু। আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। আমাদের দেশে আমরা বৈঠা মারি দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে। তোমার কায়দাটা রপ্ত করে আমার কোনো লাভ হবে না।'

পল বললে, 'তাহলে প্যারালেল বার, ডাম্বেল কিছু একটা?'

'উঁহু।'

পার্সি বললে, তাহলে পলে আমাদের বকসিং শড়বো। আপনি রেফারি হবেন।'

'আমি তো ওর তত্ত্ব কিছুই জানি নে।'

'আমরা শিখিয়ে দেব।'

'উঁহু।'

পল তখন ধীরে ধীরে বললে, 'আসলে আপনি কোনো রকম নড়াচড়া করতে চান না। একসেরসাইজের কথা না হয় রইল কিন্তু আর সবাই তো সকাল-বিকেল জাহাজটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ দেয় শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য। আপনি তো তাও করেন না। কেন বগুন তো?'

আমি বললুম, 'আরেক দিন হবে। উপস্থিত অদ্যকার অন্য কর্মসূচী কি?'

পার্সি বললে, 'আজ এগারোটিয় লাউঞ্জে চেয়ার মুজিক। তাই না হয় শোনা যাবে।'

পল আপত্তি জানাল। বললে, 'যে লোকটা বেহালা বাজায় তার বাজনা শুনে মনে হয়, দুটো হুলো বেড়াতে মারামারি লাগিয়েছে।'

পার্সি বললে, 'ঐ তো পলের দোষ। বড্ড পিটপিটে। আরে বাপু, যাক্সিস তো সস্তা ফরাসী 'মেসাজেরি মারিতিম' জাহাজে আর অশা কর্হিস, ক্রাইজলার এসে তোর কেবিনের জানালার কাছে চাঁদের আলোতে বেহালা দিয়ে সেরেনেড বাজাবেন।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক বুড়ি কিনে আনল এক পয়সার তেল। পরে দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে ফেরত দিতে গিয়ে বললে, 'তেলে মরা মাছি।' দোকানী বললে, 'এক পয়সার তেলে কি ভূমি একটা মরা হাতি আশা করেছিলে?'

পার্সি বললে, 'এইবার আপনাকে বাগে পেয়েছি, স্যার! আপনি যে গল্পটি বললেন তার যে বিলিতি মুদ্রণটি আমি জানি সে এর চেয়ে সরেস।'

আমি চোখ বন্ধ করে বললুম, 'কীতন কর।'

পার্সি বললে, 'এই আমাদের পলেরই মত এক পিটপিটে মেমসারয়েব গিয়েছেন মোজা কিনতে। কোনো মোজাই তার পছন্দ হয় না। শেষটায় সবচেয়ে সস্তায় এক শিলিঙে তিনি এক জোড়া মোজা কিনলেন। দোকানী যখন মোজা প্যাক করছে তখন তাঁর চোখে পড়ল মোজাতে অতি ছোট্ট একটি ল্যাডার—'

আমি শুধোলুম, 'ল্যাডার মানে কি? ল্যাডার মানে তো মই।'

'আজ্ঞে, মোজার একগাছা টানার সুতো যদি ছিঁড়ে যায় তবে ঐ জাগায় শুধু পড়েনগুলো একটার উপর একটা এমনভাবে থাকে যেন মনে হয় সিঁড়ি কিংবা মই। তাই ওটাকে তখন ল্যাডার বলা হয়।'

আমি বললুম, 'থ্যাঙ্কিউ, শেবা হল। তারপর কি হল?'

'মেম বললেন, ও মোজা আমি নেব না, ওতে একটা ল্যাডার রয়েছে।'

‘দোকানী বললে, ‘এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি একটা মার্বেল স্টেয়ারকেস আশা করেছিলেন, ম্যাডাম?’

আমি বললুম, ‘সাবাস, তোমার বলা গল্পটি আমার গার্হস্থ্য সংস্করণের রাজসংস্করণ বলা যেতে পারে। তদুপরি তোমরা তো রাজার জাত।’

পার্সি বললে, ‘ও কথাটা নাই বা তুললেন, স্যার।’

আমি আমার চোখ বন্ধ করে বললুম, ‘জাহাজের দুর্ব্যবহ গঠানগতিক জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করবার জন্য কোম্পানি অন্য অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন?’

পার্সি বললে, ‘সঙ্গীতে যখন পলের আপত্তি তখন আমি ভাবছি ঐ সময়টায় আমি সেলুনে চুল কাটাতে যাবো।’

আমি হস্তদত্ত হয়ে বললুম, ‘অমন কর্মটি গলা কেটে ফেললেও করতে যোগ্য না, পার্সি। তোমার চুল কেটে দেবে নিচয়ই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার ‘হজ্জামৎ’ও করে দেবে।’

‘কথাটা বুঝতে পারলুম না, স্যার।’

আমি বললুম, ‘ওটা একটা উর্দু কথার আড়। এর অর্থ, তোমার চুল নিচয়ই কেটে দেবে ভালো করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও মুড়িয়ে দেবে।’

পার্সি আরো সাত হাত জলে। শুধোলে, ‘চুল যদি ভালো করে কাটে তবে মাথা মুড়াবে কি করে?’

আমি বললুম, ‘তোমার চুল কাটাতে শব্দার্থে, কিন্তু মাথা মুড়াবে বক্রার্থে, অর্থাৎ মোটাকরিকেলি। মোদ্দাকথা, তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করবে। জাহাজে চুল কাটানোর দর্শনী পঞ্চ মুদা।’

পল বললেন, ‘সে কি স্যার? চীন দেশে তো পাঁচ টাকায় কুড়ি বার চুল কাটানো যায়।’

আমি বললুম, ‘ভারতবর্ষেও তাই। এমন কি বিশ্বক্যাপানের রাজধানী প্যারিসেও চুল কাটাতে পাঁচ টাকা লাগে না। ব্যাপারটা হয়েছে কি, জাহাজের ফাস্টক্রাসে যাচ্ছেন পয়সাওলা বড়লোকরা। তারা পাঁচ টাকার কমে চুল কাটান না। কাজেই রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে পাঁচ টাকা। আমাদের কথা বাদ দাও, এখন যদি কোন ডেকপ্যাসেঞ্জারও চুল কাটাতে যায় তবে তাকেও দিতে হবে পাঁচ টাকা।’

‘তা হলে উপায়? একমাথা চুল নিয়ে লণ্ডনে নামলে পিসিমা কি ভাববেন? তার উপর পিসিমাকে দেখাবো জীবনে এই প্রথম, পিসিমার কথা উঠলে বাবা মা যে ভাবে সমীহ করে কথা বলেন তার থেকে মনে হয় তিনি খুব সোজা মহিলা নন। তা হলে পাঁচটা টাকা দরিয়্যার জলে ভেসে গেল আর কি, একদম শব্দার্থে।’

আমি বললুম, ‘আদর্শেই না। জিবুটি বললে চুল কাটাতে। বিবেচনা করি, সেখানে চুল কাটাতে এক শিলিঙের কম লাগবে।’

পল বললে, ‘আমরা যখন বন্দরে রৌদ লাগাবো তখন পার্সিটা একটা যিঞ্জি সেলুনে বসে চুল কাটাতে। তা হলে তার উপযুক্ত শিক্ষা হয়।’

পার্সি আমার দিকে করুণ নয়নে তাকাল।

আমি বললুম, ‘তা কেন? বন্দর দেখার পর তোমাতে আমাতে যখন কাফেতে বসে কফি খাবো তখন পার্সি চুল কাটাবে। চাই কি, হয়তো সেলুনের বারান্দায় বসেই কফি খেতে খেতে পার্সিকে আমাদের মহামূল্যবান সঙ্গসুখ দেব, অমূল্য উপদেশ বিতরণ করব।’

পার্সি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাও করে বললে, ‘এ যাত্রায় আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে, স্যার, আমাদের যে কি হত—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘কিছুই হত না। আমার সঙ্গে বজর বজর না করে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে, পাঁচ রকমের ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে আলা-পচারি হত। অনেক দেখতে, অনেক শুনতে।’

দুজনাই সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল।

আমি আরব সাগরের আবহাওয়া সম্বন্ধে একখানা বিরাট কেতাব নিয়ে পড়তে লেগে গেলুম।

৬

আরবের তুলনায় বাঙালী যে অতিশয় নিরীহ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় কিন্তু আরব সাগর, সাগর হয়েও বঙ্গোপসাগরের উপসাগরের চেয়ে অনেক বেশী শান্ত এবং ঠাণ্ডা। মাদ্রাজ থেকে কলকাতা পর্যন্ত অধিকাংশ যাত্রী সী-সিকনেসে বেশ কাবু হয়ে থাকার পর এখানে তারা বেশ চম্ভা হয়ে উঠেছেন। উত্তর-পূর্ব দিকে মৃদু-মন্দ মৌসুমী হাওয়া বইছে তখনো— এই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েই ভাস্কো দা গামা আফ্রিকা থেকে ভারতে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে ঐ হাওয়া ভারতের দিকে বয় সে আবিষ্কার গামার নয়। আরবরা এ হাওয়ার গতিবিধি সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকিব-হাল ছিল এবং বিশেষ ঋতুতে (মৌসুম) এ হাওয়া বয় বলে এর নাম দিয়েছিল মৌসুমী হাওয়া। ইংরাজী শব্দ ‘মনসুন’ এবং বাঙলা ‘মরশুম’ এই মৌসুম শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু মৌসুমী হাওয়ার খানিকটে সন্ধান পাওয়ার পরও গামা একা সাহস করে আরবসাগর পাড়ি দিতে পারেন নি। আফ্রিকা থেকে একজন আরবকে জোর করে জাহাজে ‘পাইলট’ রূপে এনেছিলেন।

রোমানরাও নিচয়ই এ হাওয়ার খবর কিছুটা রাখতো। না হলে আরবদের বহু পূর্বে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তারা এতখানি ব্যবসা-বাণিজ্য করলো কি করে? এখানে দক্ষিণ ভারতের বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে রোমান মুদা বেরোয়।

ভারত পূর্বে গ্রীক, ফিনিশিয়ানরা এ হাওয়ার খবর কতখানি রাখতো আমার বিদ্যে অতদূর পৌঁছয় নি। তোমরা যদি কেতাবপত্র খেঁটে আমাকে খবরটা জানাও তবে বড় খুশী হই।

এই হাওয়াটাকেই ট্যারচা কেটে কেটে আমাদের জাহাজ এগোচ্ছে। এ হাওয়া যতক্ষণ মোলায়েম ভাবে চলে ততক্ষণ কোনো ভাবনা নেই। জাহাজ অঙ্গ-স্বঙ্গ দোলে বটে তবু উল্টো দিক থেকে বইছে বলে গরমে বেগুন-পোড়া হতে হয় না। কিন্তু ইনি রক্তমূর্তি ধরলেই জাহাজময় পরিত্রাহি চিৎকার উঠবে। এবং বছরের এ সময়টা তিনি যে মাসে সন্তত দু-তিনবার জাহাজগুলোকে গুণ্ডগু করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান সে সুখবরটা আবহাওয়ার বইখানাতে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আবহাওয়ার বিজ্ঞান ঝড় ওঠবার পূর্বাভাস খানিকটা দিতে পারে বটে কিন্তু আরব সাগরের মাঝখানে যে ঝড় উঠল সে যে তার পর কোন দিকে ধাওয়া করবে সে সম্বন্ধে আগে-ভাগে কোনো কিছু বলে দেওয়া যায় অসম্ভব।

তাই সে ঝড় যদি পূর্ব দিকে ধাওয়া করে তবে ভারতের বিপদ, বোম্বাই, কারওয়ান, তিব্ব অনন্তপুরম (শ্রী অনন্তপুর, টিভাগুরম) অঞ্চল লগুতগু করে দেবে। যদি উত্তর দিকে যায় তবে পার্শ্বিয়ান গালফ এবং আরব-উপকূলের বিপদ আর যদি পশ্চিম পানে আক্রমণ করে তবে আদন বন্দর এবং আফ্রিকার সোমালিদেশের প্রাণ যায় যায়।

একবার নাকি এই রকম একটা ঝড়ের পর সোমালিদের ওবোক শহরে মাত্র একখানা বাড়ি ঝাড়া ছিল। সে ঝড়ে শহরের সব বাড়ি পড়ে যায়, তার সঙ্গে যদি মাঝ দরিয়ায় আমাদের জাহাজের মোলাকাত হয় তবে অবস্থা কি রকম হবে খানিকটা অনুমান করা যায়।

তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এ রকম ঝড়ের সঙ্গে মানুষের এক বারের বেশী দেখা হয় না। প্রথম ধাক্কাতেই পাতাল প্রাপ্তি।

'পাতাল-প্রাপ্তি' কথাটা কি ঠিক হল? কোথায় যেন পড়েছি, জাহাজ ডুবে গেলে পাতাল অবধি নাকি পৌঁছয় না। খানিকটে নাবার পর ভারী জল ছিন্ন করে জাহাজ নাকি আর তলার দিকে যেতে পারে না। তখন সে ত্রিশছুর মতো ঐখানেই ভাসতে থাকে।

ভাবতে কি রকম অদ্ভুত লাগে! সমুদ্রের এক বিশেষ স্তরে তাহলে যত সব জাহাজ ডোবে তারা যত দিন না জরাজীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় ততদিন শুধু ঘোরাফেরাই করবে!

জলে যা, হাওয়াতেও বোধ করি তাই। বেলুন টেলুন জোরদার করে ছাড়তে পারলে বোধ হয় উড়তে উড়তে তারা এক বিশেষ স্তরে পৌঁছলে ঐখানেই ঝুলতে থাকবে—না পারবে নিচের দিকে নামতে, না পারবে উপরের দিকে যেতে। তারই অবস্থা কল্পনা করে বোধ হয় মুনি-ঋষিরা ত্রিশছুর স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে ঝুলে থাকার কথা কল্পনা করেছিলেন।

আমাকে অবশ্য কখনো কোনো জায়গায় ঝুলে থাকতে হবে না। দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় যা গুরুভোজন করে থাকি তার ফলে ডুবলে পাথরবাটির মত তরতর করে একদম নাক-বরাবর পাতালে পৌঁছে যাব। আহা! তার পর আমার যা ওজন

হয় সে গুরুতার সমুদ্রের যে-কোনো নোনা জলকে অনায়াসে ছিন্ন করতে পারে। আমার ভাবনা শুধু আমার মুণ্ডটাকে নিয়ে। মগজ সেটাতে এক রপ্তিও নেই বলে সেটা এমনি ফীপা যে, কখন যে ধড়টি ছেড়ে হশ করে চন্দ্র-সূর্যের পানে ধাওয়া করবে তার কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যে যদি আমাকে সনাক্ত করতে চাও তবে শুধু লক্ষ্য করো কোন লোকটা দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে নড়াচড়া করছে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম আমার সখা এবং সতীর্থ—একই তীর্থে যখন যাচ্ছি তখন 'সতীর্থ' বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়—শ্রীমান পল কোথা থেকে একটা টেলিফোন যোগাড় করে একদৃষ্টে দক্ষিণ পানে তাকিয়ে আছে। ভালুপ, ঐ দিক দিয়ে বোধ হয় কোনো জাহাজ যাচ্ছে আর সে তার নামটা পড়ার চেষ্টা করছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে কাছে এসে বললেন, 'ঐ দূরে যেন ল্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'ল্যাণ্ড নয়, আইল্যান্ড। ওটা বোধ হয় মাল-দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটা হবে।'

পল বললে, 'কই, ওগুলোর নাম তো কখনো শুনি নি।'

আমি বললুম, 'শুনবে কি করে? এই জাহাজে যে এত লোক, এদের সম্বাইকে জিজ্ঞেস করো ওঁদের কেউ মালদ্বীপ গিয়েছেন কি না? অদূরেই বা কেন? শুধু জিজ্ঞেস করো, মালদ্বীপবাসী কারো সঙ্গে কখনো ওঁদের দেখা হয়েছে কি না? তাই মালদ্বীপ নিয়ে এ বিশ্বভুবনে কারো কোনো কৌতূহল নেই।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'শুনেছি, মালদ্বীপের লোকেরা খুব ধর্মভীরু হয়। এক মালদ্বীপবাসীর তাই ইচ্ছে হয়, তার ছেলেকে মুসলিম শাস্ত্র শেখাবার। মালদ্বীপে তার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তিনি ছেলেকে কাইরোর আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান—এটেই ইস-লামী শাস্ত্র শেখার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলটির সঙ্গে আমার আলাপ হয় ঐখানে। বহুবার দেখা হয়েছিল বলে সে আমাকে তার দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছিল, তবে সে অনেক কাল হল বলে আজ আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

'ওখানে নাকি সবসুদ্ধ হাজার দুই ছোট ছোট দ্বীপ আছে এবং তার অনেকগুলোতেই খাবার জল নেই বলে কোনো প্রকারের বসতি নেই। মালদ্বীপের ছেলটি আমায় বলেছিল, 'আপনি যদি এরকম দশ-বিশটা দ্বীপ নিয়ে বলেন, এগুলো আপনার, আপনি এদের রাজা, তাহলে আমরা তাতে কণামাত্র আপত্তি জানাবো না।' অন্যগুলোতেও বিশেষ কিছু ফলে না; সবচেয়ে বড় দ্বীপের দৈর্ঘ্য নাকি মাত্র দুমাইল। মালদ্বীপের সুলতান সেখানে থাকেন এবং তাঁর নাকি ছোট একখানা মটরগাড়ি আছে। তবে যেখানে সব চেয়ে লম্বা রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র দু-মাইল সেখানে ওটা চালিয়ে তিনি কি সুখ পান তা তিনিই বলতে পারবেন।'

মালদ্বীপে আছে প্রচুর নারকেল গাছ আর দ্বীপের চতুর্দিকে জাত বেজাতের মাছ কিলবিল করছে। মাছের শুটকি আর নারকেলে নৌকো ভর্তি করে পাশ তুলে দিয়ে তারা রওয়ানা হয় সিংহলের দিকে মৌসুমী হাওয়া বইতে আরম্ভ করলেই। হাওয়া তখন মালদ্বীপ থেকে সিংহলের দিকে বয়। সমস্ত বর্ষাকালটা সিংহলে ঐ সব বিক্রি করে এবং বদলে চাল ডাল কাপড় কেরোসিন তেল কেনে। কেনাকাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের নাকি সেখানে বহুদিন কাটাতে হয়, কারণ উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করবে শীতের শুরুতে। তার আগে তো ফেরার উপায় নেই।

পার্সি বললে, 'কেন স্যার, এখন তো শীতকাল নয়। আমরা তো হাওয়ার উল্টো দিকেই যাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'প্রাতঃ, আমাদের জাহাজ চলে কলে, হওয়ার তোয়াকা সে করে খোঁড়াই। মালদ্বীপে কোনো কলের জাহাজ যায় না, খরচায় পোষায় না বলে। তাই আজ পর্যন্ত কোনো টুরিস্ট মালদ্বীপ যায়নি।'

'তাই মালদ্বীপের ছোকরাটি আমার বলেছিল, আমাদের ভাষাতে 'অতিথি' শব্দটার কোনো প্রতিশব্দ নেই। তার কারণ বহুশত বৎসর ধরে আমাদের দেশে ভিনদেশী লোক আসেন নি। আমরা এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যা অল্প স্বল্প হাওয়া-আসা করি তা এতই কাছাকাছির ব্যাপার যে কাউকে অন্যের বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে হয় না।' তারপর আমার বলেছিল, 'আপনার নেমন্তন্ন রইল মালদ্বীপ ভ্রমণের কিছু আমি জানি, আপনি কখনো আসবেন না। যদিচ এসে যান তাই আগের থেকেই বলে রাখছি, আপনাকে এর বাড়ি ওর বাড়ি করে করে অস্বস্ত বহুর তিনেক সেখানে কাটাতে হবে। খাবেন-দাবেন, নারকেল গাছের তলাতে চাঁদের আলোয় গাওনা-বাজনা শুনবেন, বাস, আর কি চাই।'

'যখন শুনেছিলুম তখন যে যাবার লোভ হয়নি এ-কথা বলবো না। ঝাড়া তিনটি বছর (এবং মালদ্বীপের ছেলেটি আশা দিয়েছিল যে সেখানে যাহা তিন তাহা তির্যন্দুই) কিছুটা করতে হবে না, এবং শুধু তিন বৎসর না, বাকি জীবনটাই কিছু করতে হবে না। এ-কথাটা ভাবলেই যেন চিত্তবনের উপর দিয়ে মর্মর গান তুলে মন্দিরে মলয় বাতাস বয়ে যায়। একজামিনের ভাবনা, কেঁটার কাছে দু-টাকার দেনা, সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক মুহূর্তেই মুক্তি! অহো!

'কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ

দিবা-রাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—

সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে

তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ।'

এ-সব আত্মচিন্তার সব কিছুই যে পল-পার্সিকে প্রকাশ করে বলেছিলুম তা নয়, তবে একটা কথা মনে আছে, ওরা যখন উৎসাহিত হয়ে মালদ্বীপে বাকি জীবনটা কাটাতে বলে আমাকে সে খবরটা দিলে তখন আমি বলেছিলুম,—

'বাকি জীবন কেন, তিনটি মাসও সেখানে কাটাতে পারবে না। তার কারণ

যেখানে কোনে কাজ করার নেই, সেখানে কাজ না করাটাই হয়ে দাঁড়ায় কাজের কাজ। এবং সে ভয়াবহ কাজ। কারণ, অন্য যে-কোনো কাজই নাও না কেন, যেমন মনে করো এগজামিন—তারও শেষ আছে, বি-এ, এম-এ, পি-এইচ-ডি,—তার পর কোনো পরীক্ষা নেই। কিংবা মনে করো উঁচু পাহাড়ে চড়া। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, ত্রিশ হাজার ফুট, যাই হোক না কেন তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু 'কাজ নেই'—এ হল একটা জিনিস যা নেই, কাজেই তার আরম্ভও নেই শেষও নেই। যে জিনিসের শেষ নেই সে জিনিস শেষ পর্যন্ত সহিতে পারা যায় না।

'কিংবা অন্যদিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে পারো।'

'আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মনে করো একটা ঘর। ঘরে আসল জিনিস—দি ইমপটেন্ট এলমেন্ট—হল তার ফাঁকাটা, আমরা তাতে আসবাবপত্র রাখি, খাই-দাই, সেখানে রৌদ্রবৃষ্টি থেকে শরীরটা বাঁচাই। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু এসব কাজে লাগছে না। অর্থাৎ ইমপটেন্ট হল ফাঁকাটা, নিরেট দেয়ালটা নয়। তাই বলে দেয়ালটা বাদ দিলে চলবে না। দেয়ালহীন ফাঁকা হল ময়দানের ফাঁকা, সেখানে আগ্রয় জোটে না।

'তাই গুরুদেব বলেছেন, মানুষের জীবনের অবসরটা হচ্ছে ঘরের ফাঁকাটার মত, সে-ই দেয় আমাদের প্রবেশের পথ কিন্তু কিছুটা কাজের দেয়াল দিয়ে সেই ফাঁকা অবসরটাকে যদি ঘিরে না রাখা তবে তার থেকে কোনো সুবিধে ওঠাতে পারো না। কিন্তু কাজ করবে যতদূর সম্ভব কম। কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো, ঘরের মধ্যে ফাঁকাটা দেয়ালের তুলনায় পরিমাণে অনেক বেশী।'

তারপর আমি বললুম, 'কিন্তু প্রাচুর্য, আমার গুরুদেব এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন ভারি সুন্দর ভাষায় আর সুমিষ্ট ব্যঞ্জনায়, কিছুটা উষ্টার সন্দের হাস্যকৌতুক মিশিয়ে দিয়ে। আমি তার অনুকরণ করব কি করে?'

'কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত এই,—মালদ্বীপের একটানা কর্মহীনতার ফাঁকাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তার চতুর্দিকে সামান্যতম কাজের দেয়াল নেই বলে।'

একটানা এতখানি কথা বলার দরুন ক্লান্ত হয়ে ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলুম।

তখন লক্ষ্য করলুম, পল ঘন-ঘন ঘাড় চুলকোচ্ছে। তারপর 'হঠাৎ ডান হাতটা মুঠো করে মাথায় ধীই করে গুণ্ডা মেরে বললে, 'পেয়েছি, পেয়েছি, এই বারে পেয়েছি।'

কি পেয়েছে সেইটে আমি শুধোবার পূর্বেই পার্সি বললে, 'ঐ হচ্ছে পলের ধরন। কোনো একটা কথা স্বরণে আনবার চেষ্টা করার সময় সে ঘন-ঘন ঘাড় চুলকায়। মনে এসে যাওয়া মাত্রই ঠাস করে মাথায় মারবে এক ঘুষি। ক্রাসেও ও তাই করে। আমরা তাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে থাকি। এবারে শুনুন, ও কি বলে।'

পল বললে, 'কোনো নতুন কথা নয়, স্যার! তবে আপনার গুরুর তুলনাতে মনে পড়ে গেল আমার গুরু 'কনফুৎস'র 'আমার মনে বড় আনন্দ হল যে ইংরেজ

ছেলেটি 'কন-ফু-ৎস'কে 'আমাদের গুরু' বলে সম্মান জানাল-ভারতবর্ষের ইবেজ ছেলে-বুড়ো বুড়কে কখনো 'আমাদের গুরু', বলে নি। এ বিষয়ে অন্য এক তুলনা। যদি অনুমতি দেন—

আমি বললুম, 'কী জ্বালা! তোমার এই চীনা লৌকিকতা-ভদ্রতা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। 'কন-ফু-ৎস'র তত্ত্বচিন্তা শুনে চায় না কোন্ মকট? জানো, ঋষি কন-ফু-ৎস আমাদের মহাপুরুষ গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক? ঐ সময়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ইরানে জরথুষ্ট্র, গ্রীসে সোক্রেতেস-প্রাতো-আরিস্তোতেলেসে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভিতরে—তা থাক গে, তোমার কথা বলো।'

পল বললে, 'সরি, সরি। কন-ফু-ৎস বলেছেন, 'একটি পেয়ালার আসল (ইমপর্টেন্ট) জিনিস কি? তার ফাঁকা জায়গাটা, না তার পর্সেলেনের ভাগটা? ফাঁকা জায়গাটাই আমরা রাখি জল, শরবত, চা। কিন্তু পর্সেলেন না থাকলে ফাঁকাটা আদর্শেই কোনো উপকার করতে পারে না। অতএব কাজের পর্সেলেন দিয়ে অকাজের ফাঁকাটা ঘিরে রাখতে হয়। এবং শুধু তাই নয়, পর্সেলেন যত পাতলা হয়, পেয়ালার কদর ততই বেশী। অর্থাৎ কাজ করবে যতদূর সম্ভব সমান্যতম।'

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে কাণ্ড-টাণ্ড করে অর্থাৎ চীনা পদ্ধতিতে আমার হাঁটু আর মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বললে,—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ফের তোমার চীনে সৌজন্য?'

বললে, 'সরি সরি। কিন্তু স্যার, ঐ মালদ্বীপের কথা ওঠাতে আর আপনি আপনার গুরুদেবের কথা বলতে আমার কাছে 'কন-ফু-ৎস'র তত্ত্বচিন্তা আজ সরল হয়ে গেল। ওঁর এ বাণী বহুবার শুনেছি, অনেকবার পড়েছি কিন্তু আজ এই প্রথম—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'চোপ।'

৪

কোনো কোনো জাহাজে কি যেন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাওয়াকে ঠান্ডা করে সেইটে জাহাজের সর্বত্র চালিয়ে দেওয়া হয়। মনে হয়, এই রৌদ্র-দহ, জ্বরতপ্ত বিরাট জাহাজরূপী লৌহদানবকে তার মা যেন ঠান্ডা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু পারেন কতখানি? বরঞ্চ রেলগাড়ি প্র্যাটফর্মে প্র্যাটফর্মে ছায়াতে দু-দশ মিনিট ঠান্ডা হবার সুযোগ পায়, কিংবা উপত্যকার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ে এসে পাহাড়ের ছায়া পড়ে, ঘন শালবনের ভিতর দিয়েও গাড়ি কখনো কখনো বনানীর স্নিগ্ধছায়া লাভ করে, এবং সুডূর হলে তো কখাই নেই—সেখানকার ঠান্ডা তো রীতিমত বরফের

বাক্সের ভিতরকারের মতো—কিন্তু জাহাজের কপালে এসব কিছুই নেই। একে তো দিগ্-দিগন্তব্যাপী জ্বলছে রৌদ্রের বিরাট চিতা, তার উপর সূর্য তার প্রতাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন সমুদ্রের জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে। কালো চশমা পরেও তখন সেদিকে তাকানো যায় না। রাত্রে অন্ধ অন্ধ ঠান্ডা হাওয়া বয় বটে, কিন্তু সে ঠান্ডাতে গা জুড়োবার পূর্বেই দেখা দেন পূর্বাকাশে সূর্য্য-মাষ্টার ফের তাঁর রোদের চাবুক হাতে নিয়ে। ভগবান তাঁকে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ কর, এবং সেই লক্ষ লক্ষ হাতে তিনি নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ পাকা কঙ্কির সোনালি রঙের চাবুক। দেখা মাত্রই গায়ের সব কটা লোম কীটা দিয়ে খাঁড়া হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাহাজে ঠান্ডা বাতাস চালানোর ব্যবস্থা ছিল না—অর্থাৎ সেটা আর-কভিশন্ড নয়। কাজেই কি দিনের বেলা কি রাত্রে কখনো ভালো করে ঘুমোবার সুযোগ বঙ্গোপসাগর, আরব সমুদ্র কিংবা লাল দরিয়ায় মানুষ পায় না।

দুপুর রাত থেকে হয়তো ঠান্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। ডেকে বসে ছুঁমি গা জুড়োলে। কিন্তু তখন যে কেবিনে ঢুকে বিছানা নেবে তার উপায় নেই। সেখানে ঐ ঠান্ডা হাওয়া যেতে পারে না বলে অসহ্য গুমোট গরম। গভীর মাঠ ঠান্ডা হয়ে ফিরে এসে গলিবাড়িতে ঘুমোবার চেষ্টা করার সঙ্গে এর খানিকটে তুলনা হয়।

ডেকে যে আরাম করে ঘুমোবে তারও উপায় নেই। ঘুমলে হয়তো রাত দুটোর সময়। চারটে বাজতে না বাজতেই খালসীরা ডেকে বালতি বালতি জল ঢেলে সেখানে যে বন্যা জাগিয়ে তোলে তার মঝখানে মাছও ঘুমতে পারে না। তখন যাবে কোথায়? কেবিনে ঢুকলে মনে হবে যেন রুটি বানানোর তন্দুরে—আত্মনে—তোমাকে রোস্ট করা হবে।

এই অবস্থা চলবে ভূমধ্যসাগর না পৌঁছনো পর্যন্ত।

তবে সাধুনা এইটুকু যে, তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা ঠান্ডা-গরম সবকিছু আমাদের মত এতখানি সচেতন নয়। পল পার্সি তাই যখন কেবিনের ভিতর নাক করফরাতো আমি তখন ডেকে বসে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। তখন বই পড়তে কিংবা দেশে আত্মীয়-বন্ধনকে চিঠি লিখতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না।

মঝে মাঝে ডেক-চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তুম।

একদিন কেন জানিনে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই সামনে দেখি এক অপক্লপ মূর্তি।

অদলোকে কোট-পাতলুন-টাই পড়েছেন ঠিকই কিন্তু সে পাতলুন ঢিলে পাজামার চেয়েও বোধ করি চোঁড়া, কোট নেবে এসেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত আর মান-মুনিয়া দাড়ির তলায় টাইটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে মাত্র। ওঁর বেশভূষায়—ভুল করলুম, 'ভূষা' জাতীয় কোনো বালাই ওঁর বেশে ছিল না—অনেক কিছুই দেখবার মত ছিল কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমি সব-কটা লক্ষ্য করি নি, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করে অনেক কিছুই শিখেছিলাম। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম, তাঁর কোটে ব্রেস্ট পকেট বাদ দিয়েও আরো দু সারি ফালতো পকেট। তাই বোধ হয়, কোটটা দৈর্ঘ্যে হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে।



এঁকে তো এতদিন জাহাজে দেখি নি! ইনি ছিলেন কোথায়? তবে কি ইনি কলহতে উঠেছেন। তা হলেও এ দুদিন ইনি ছিলেন কোথায়?

ভদ্রলোক সোজাসুজি বললেন, 'গুড নাইট।'

বিলিতি কায়দা-কেতা যদিও আমি ভালো করে জানিনে তবু অন্তত এতটুকু জানি যে 'গুড নাইট' গুদেশে বিদায় নেবার অভিবাদন-আমরা যে রকম যে-কোনো সময় বিদায় নিতে হলে বলি, 'তবে আসি।' দেখা হওয়া মাত্রই কেউ যদি বলে, 'তবে এখন আসি' তবে বুঝব লোকটা বাঙালী নয়। তাই তাঁর 'গুড নাইট' থেকে অনুমান করলুম, ইনি যদিও বিলিতি বেশ ধারণ করেছেন তবু আসলে ভারতীয়।

আমি বললুম, 'বৈঠিয়ে।'

আমার বাঁ দিকে পার্সির শূন্য ডেক-চেয়ার। তিনি তার-ই উপরে বসে পড়ে আমাকে বললেন, 'আমার নাম আবুল আসফিয়া, নূর উদ্দীন, মুহম্মদ আব্দুল করীম সিদ্দীকী।'

আমার অজানাতেই আমি বলে ফেলেছিলুম, 'বাপস।' কেন, সে কথা কি আর খুলে বলতে হবে? তবু বলি।

আমি মুসলমান। আমার নাম সৈয়দ মুজতবা আলী, আমার পিতার নাম সৈয়দ সিকন্দর আলী। আমার ঠাকুরদাদার নাম সৈয়দ মুশররফ আলী। ভারতীয় মুসল-মানের নাম সচরাচর তিন শব্দেই শেষ হয়। তাই এঁর আড়াইগল্গী নামে যে আমি হকচকিয়ে খাব তাতে আর বিচিত্র কি?

বিবেচনা করি, তিনিও বিলক্ষণ জানতেন। কারণ চেয়ারে বসেই, তিনি তাঁর অন্যতম পকেট থেকে বের করলেন একটি সুন্দর সোনার কেস। তার থেকে একটি ডিজিটিং কার্ড বের করে, আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নামটা একটু লম্বা। তাই এইটে নিন।'

আমি তো আরো অবাক। ডিজিটিং কার্ডের কেস হয় তা আমি জানি। কারণ, ডিজিটিং কার্ড সুন্দর সুচিকণ। যীদের তা থাকে তাঁদের কেউ কেউ সেটা কেসে রাখেন। যেমন মনে করো, ইনস্তুওরেন্সের দালাল, খবরের কাগজের সংবাদদাতা কিংবা ভোটের ক্যানভাসার। কিন্তু ওঁদেরও তো কেস দেখেছি জার্মান সিলভারে তৈরি। ডিজিটিং কার্ডের সোনার কেস পূর্বে আমি কখনো দেখি নি।

সেই বিষয় সামলাতে না সামলাতেই তিনি আরেক পকেটে হাত চালিয়ে ডুবুরির মত গভীর তল থেকে বের করলেন এক সোনার সিগারেট কেস। ও রকম কেস আমি শুধু স্বপ্নে আর সিনেমায় ফিল্মস্টারদের হাতে দেখেছি, বাস্তবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। ডেকের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ আলোতেও সেটা যা ঝলমল করে উঠল তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় শুধু স্যাকরা-বাড়ি থেকে সদা-আসা গয়নার সঙ্গে। কেসের এক কোণে আবার কি যেন এক নীল রঙের পাথর দিয়ে আলপনা একে ইংরিজী অঙ্কে ভদ্রলোকের সেই লম্বা নামের গুটি দু-তিন আদ্যক্ষর। কেসটি আবার সাইজের বিরূপ। নিদেনপক্ষে ত্রিশটি সিগারেট ধরবে। আমার সামনে

কেসটি খুলে ধরে আরেক পকেট থেকে বের করলেন একটি লাইটার। তার উপর জয়পুরী মিনার কাজ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জমিদারবাড়ির বড় গিনিমার কবচ কিংবা মাদুলী।

আমার মনের ভিতর দিয়ে হড়-হড় করে এক পল্টন সেপাইয়ের মত পঞ্চাশ সার প্রশ্ন চলে গেল।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ-রকম লজ্জাবড় কোট-পাতলুনের ভিতর অত সব সুন্দর সুন্দর দামী দামী জিনিস লোকটা রেখেছে কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন সব দামী মাল যার পকেটে আছে, সে ফাষ্ট ক্লাসে না গিয়ে, আমার মত গরীবের সঙ্গে টুরিস্ট ক্লাসে যাচ্ছে কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন-তা সে যাক গে। কারণ সব কটা প্রশ্নের পুরো ফর্দ এখানে দিতে গেলে আমার বাকি দিনটা কেটে যাবে। আর তোমাদেরও বুদ্ধিগুদ্ধি আছে, ভদ্রলোকের বর্ণনা শুনে তোমাদের মনেও সেই সব প্রশ্ন জাগবে যেগুলো আমার মনে জেগেছিল। তবে আর সেগুলো সবিস্তর বলি কেন?

কিছু প্রশ্নগুলোর উত্তর পাই কি প্রকারে?

তিনি বয়সে আমার চেয়ে ঢের বড়। তিনি যদি আলাপচারী আরম্ভ না করেন তবে আমি তাঁকে প্রশ্ন শুধাই কি করে? মুরুব্বিদের আদেশ, ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি, বড়রা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন-ছোটরা উত্তর দেবে। সে আদেশ লঙ্ঘন করব কি করে? বিশেষ করে বিদেশে, যেখানকার কায়দা-কেতা জানিনে। সেখানে দেশের গুরুজনদের আদেশ স্বরণ করা ভিন্ন অন্য পুজি আছে কি?

আধ ঘণ্টাটুকু কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আমি তাঁর দু-দুটো সিগারেট পুড়িয়েছি। ফের যখন তৃতীয়টা বাড়িয়ে দিলেন তখন আমাকে বেশ দৃঢ়ভাবে 'না' বলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে সাহস সঞ্চয় করে শুধালুম, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

যেন প্রশ্ন শুনেতে পাননি। আমিও চাপ দিলুম না।

আমি খানিকক্ষণ পরে বললুম, 'মাক করবেন, আমি শুতে চললুম, 'গুড নাইট।' বললেন, 'গুড নাইট।'

কী জানি, 'লোকটা কেন কথা বলে না। বোধ হয় জ্বিভে বাত হয়েছে। কিংবা হয়তো ওর দেশে কথা বলাতেও রেশনের আইন চলে। যাক গে, কি হবে ভেবে।'

পরদিন সকালবেলা পল পার্সিকে নিয়ে আমি যখন সংসারের যাবতীয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন এবং সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় সেই ভদ্রলোক এসে আবার উপস্থিত। আমি ওঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিতেই তিনি তাঁর আরেকটা পকেটে হাত চালিয়ে বের করলেন একরাশ সুইস চকলেট, ইংরিজী টফি এবং মার্কিন চুইংগাম। পল পার্সি গুটি কয়েক হাতে তুলে নিয়ে যতই বলে, 'আর না, আর না।' তিনি কিছু বাড়ানো হাত গুটোন না। ওঁদিকে মুখে কোনো কথা নেই। শেষটার বিষয় রদবদল একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমরা খানিকটে ইতি-উতি করে পুনরায় নিজেদের গল্পে ফিরে গেলুম। তখন দেখি, ভাষণে অরলি হলেও তিনি শ্রবণে কিছুমাত্র পশ্চাদপদ নন। আমাদের

গজের মাঝে মাঝে তাগম্যফিক 'হঁ', 'হী' দিবা বলে যেতে লাগলেন। তারপর আমাদের তিনজনকে কিছুতেই 'লাইম স্কোয়াশ' খাওয়াতে না পেরে আন্তে আন্তে উঠে চলে গেলেন।

উঠে যাওয়া মাত্রই আমি পলকে শুধালুম, 'এ কি রকম চিড়িয়া হে?'

পল বললে, 'কল্যাণে উঠছেন। পকেট-ভর্তি দুনিয়ার সব চুকিটাকি, মিষ্টি-মিঠাই। যার সঙ্গে দেখা তাকেই কিছু-না-কিছু একটা অফার করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁকে কথা বলতে শুনিনি।

আমি বললুম, 'জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে তো।'

পল বললে, 'উত্তর কি পাবেন?'

বললুম, 'ঠিক বলেছি, কাল রাত্রে তো পাইনি।'

এর সন্ধ্যা যে এত কথা বললুম, তার কারণ এর সঙ্গে পরে আমাদের খুব বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল; সে কথা সময় এলে হবে।



পল বিজ্ঞ কণ্ঠে বললে, 'কল্যাণ থেকে আদন বন্দর ২০৮২ মাইল রাস্তা। জাহাজে ছদিন লাগে। মাঝখানে দ্বীপ-দ্বীপ নেই, অন্তত আমার মাপে নেই। তবে আদনের ঠিক আগেই সোকোত্রা দ্বীপ। সেটা হয়তো দেখতে পাব।'

আমি বললুম, 'যদি রাত্রিবেলা ঐ জায়গা দিয়ে যাই তবে দেখবে কি করে? আর দিনের বেলা হলেও অতখানি পাশ দিয়ে বোধ হয় জাহাজ যাবে না। তার কারণ বড় বড় দ্বীপের আশপাশে বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপও জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। এর কোনোটার সঙ্গে জাহাজ যদি খান্না খায় তবে আর আমরা সামনের দিকে এগুবে না—এগিয়ে যাবো তলার দিকে।'

এদিকে কথা বলে যাচ্ছি, ওদিকে আমার বার বার মনে হতে লাগল, সোকোত্রা নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার বাবার মাসী, মেসোমশাই তাঁদের দুই ছেলেকে নিয়ে গত শতকের শেষের দিকে মক্কায় হজ্ব করতে গিয়েছিলেন এবং আমার খুব ছেলেবেলায় তাঁর কাছ থেকে সে ভ্রমণের অনেক গল্প আমি শুনেছিলাম। আমার এই দাদাটি ছিলেন গল্প বলার তারি ওস্তাদ। রাত্রির রান্না না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের গল্প বলে দিবা জাগিয়ে রাখতে পারতেন এবং যেই চাটীরা খবর দিতেন, রান্না তৈরি, অমনি তিনি বেশ কায়দা করে গল্পটা শেষ করে দিতেন পারতেন। আমরা টেরই পেতুম না, আমাদের সামনে তিনি একটা নাছকটা হনুমান রেখে চলে গেলেন। আমাদের মনে হত গল্পটা যেন একটা আস্ত ডানাকাটা পরী।

সেই দাদীর মুখে শুনেছিলাম, সোকোত্রার কাছে এসে নাকি যাত্রীদের মুখ

ভুকিয়ে যেত। জলের মোতের তোড়ে আর পাগলা হওয়ার খাবড়ায় জাহাজ নাকি হড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ত কোনো একটা ডুবন্ত দ্বীপের ঘাড়ে আর হয়ে যেত জাহাজের টুকরোয় খান খান। কেউ বা জাহাজের তক্তা, কেউ বা ডুবন্ত দ্বীপের শ্যাওলা মাখানো পাথর অকিড়ে ধরে প্রাণপণ চিংকার করত 'বাঁচাও', কিন্তু কে বাঁচায় কাকে, কোথায় আলো কোথায় তীর! ক্রমে ক্রমে তাদের হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসত, একে একে জলের তলে লীন হয়ে যেত।

দাদী যে ভাবে বর্ণনা দিয়ে যেতেন, তাতে আমি সব কিছু ভুলে দুচ্ছন্দায় আকুল হয়ে উঠতুম, দাদী বাঁচলেন না, দাদীও ডুবে গেলেন। মনেই হত না জলজন্তু দাদী আমাকে কোলে বসিয়ে গল্প বলতেন। শেষটায় বলতেন, 'আমাদের জাহাজের কিছু হয়নি, এ সব ঘটেছিল অন্য জাহাজে। সে জাহাজে করে গিয়েছিলেন তোর বন্ধু ময়না মিমার ঠাকুর্দা। জানিস তো, তিনি আর ফেরেননি। খুদাতালা তাঁকে বেহেশতে নিয়ে গিয়েছেন। মক্কায় হজ্বের পথে কেউ যদি মারা যায় তবে তার আর পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না, সে সোজা স্বর্গে চলে যায়।'

দাদী এ-রকম গল্প বলে যেতেন অনেকক্ষণ ধরে আর একই গল্প বলতে পারতেন বহুবার। প্রতিবারেই মনে হত চেনা গল্প অচেনা রূপে দেখছি। কিংবা বলতে পারো, দাদী-বাড়ির রান্না বৌদিকে যেন কখনো দেখছি রাস-মন্ডল শাড়িতে, কখনো বুলবুল-চশমে। (হায়, এসব সুন্দর সুন্দর শাড়ি আজ গেল কোথায়!)

দাদীর গল্পের কথা আজ যখন ভাবি তখন মনে হয় দাদী তাঁর বর্ণনাতে আরব্য উপন্যাসের সাহায্য বেশ কিছু নিতেন। আরব্য উপন্যাসের রকম-বেরকমের গল্পের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা, জাহাজডুবি, অচেনা দেশ, অজানা দ্বীপ সবকিছু গল্প বিস্তর। সিন্ধবাদ নাবিকের গল্প পড়ে মনে হয়, জলের পীর বদর সাহেব যেন আইন বানিয়ে দিয়েছিলেন যে জাহাজ ডুববে সেটাতেই যেন সিন্ধবাদ থাকে। বেচারী সিন্ধবাদ!

আরব্য উপন্যাসে যে এত সমুদ্রযাত্রার গল্প, তার প্রধান কারণ, আরবরা এক কালে সমুদ্রের রাজা ছিল আজ যে রকম মার্কিন ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে দেখা যায়। তবে কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়না। আরব দেশের সাড়ে-তিন দিকে সমুদ্র, তাই আরবরা সমুদ্রকে ভরায় না, আমরা যে রকম পল্লী মেঘনাকে ভরায় নে, যদিও পশ্চিমা গোলার্ধের পল্লী দেখে হনুমানজীর নাম স্বরণ করতে থাকে—বোধ হয় লক্ষ দিয়ে পেরবার জন্য। আরবদের পূর্বে ছিল রোমানরা বাদশা-আরবরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদেরই মতো অবাধে অনায়াসে সমুদ্র যাত্রায় আরম্ভ করল। মাপে দেখতে পাবে, মক্কা সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয়। আরবরা তখন লাল দরিয়া পেরিয়ে মৌসুমী হাওয়ায় ভর করে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাবসা জুড়ল।

এসব কথা ভাবছি এমন সময় হঠাৎ আবার সোকোত্রার কথা মনে পড়ে গেল। দাদীমার সোকোত্রা স্বরণ করিয়ে দিল গ্রীকদের দেওয়া সোকোত্রার নাম

'দিয়েস্করিয়েস', সঙ্গে সঙ্গে হশ-হশ করে মনে পড়ে গেল যে পণ্ডিতেরা বলেন এই 'দিয়েস্করিয়েস' নাম এসেছে সংস্কৃত 'দ্বীপ-সুখাধার' থেকে। আরবরা যখন এই দ্বীপে প্রথম নামল তখন ভারতীয় বোম্বার্ডের সঙ্গে এদের লাগল বগড়া। সে বগড়া কত দিন ধরে চলেছিল বলা শক্ত কারণ আমাদের সমাজপতিরা তখন সমুদ্রযাত্রার বিলম্ব কড়া কড়া আইন জারি করতে আরম্ভ করেছেন। আমার মনে হয় এদেশ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়াতে এরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যায়, কিংবা ঐ দেশের লোকের সঙ্গে মিলে-মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়-যে রকম শ্যাম, ইন্দোচীন ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বহু শতাব্দীর আদান-প্রদানের পর একদিন আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। খুব সম্ভব ঐ সমুদ্র যাত্রা নিষেধ করারই ফলে। ভারতীয়েরা কিন্তু সোকোটায় তাদের একটি চিহ্ন রেখে গিয়েছে, সোকোটায় গাই-গোরু জাতে সিঁদ্ধ দেশের। আচ্ছ, সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিন্তু তার পোষা পোষা-ঘোড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থেকে তার প্রভুর কথা চক্ষুস্থান ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগল-পাঠানের রাজত্ব ভারতবর্ষ থেকে কবে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের আনা গোলাপ ফুল আমাদের বাগানের আরো কত শত শত বৎসর রাজত্ব করবে কে জানে।

আমি চোখ বন্ধ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন হলেই পল পার্সি আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে অন্য কিছু একটায় লেগে যেত। আমি তাদের সন্ধানে বেরিয়ে দেখি তারা লাউজো বসে চিঠি লিখছে। আমাকে দেখে পার্সি শুধালে, 'জাহাজে যে ফরাসী ডাক-টিকিট পাওয়া যায় তাই দিয়ে এ চিঠি চীন দেশে যাবে তো?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়। এমন কি জিবুটি বন্দরের ডাকঘরেরও যদি ছাড় তবু যাবে। কারণ জিবুটি বন্দর ফরাসীদের। কিন্তু যদি পোর্টসেইন্ড বন্দরে ছাড় তবে সে টিকিট মিশর দেশে বাতিল বলে চিঠিখানা যাবে বেয়ারিং পোস্টে।'

'কিন্তু যদি পোর্ট সাইদে পৌঁছে জাহাজের লেটার বকসে ছাড়ি?'

'তা হলে ঠিক।'

তারপর বললাম, 'হুঁ। তবে বন্দরে নেমে মিশরী ডাক-টিকিট লাগানোই ভালো।'

'কেন, স্যার?'

আমি বললাম, 'বৎস, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, চীন দেশে তোমার একটি ছোট বোন রয়েছে। সে নিশ্চয়ই ডাক-টিকিট জমায়ে। তুমি যদি বন্দরে বন্দরে ফরাসী টিকিট সাঁটো তার কি লাভ? মিশরী টিকিট পেলে কি সে খুশী হবে না? তাও আবার দাদার চিঠিতে।'

পার্সি আবার ভ্যাচর ভ্যাচর আরম্ভ করলে-চুল কাটা সমস্যার সমাধান যখন আমি করে দিয়েছিলাম ঠিক সেই রকম-আমার সঙ্গে দেখা না হলে—

আমি বললাম, 'বাস, বাস। আর শোনো, স্ট্যাম্প লাগানোর সময় এক পয়সা, দু'পয়সা, এক আনা, ছ'পয়সা করে করে চৌদ্দ পয়সার টিকিট লাগাবে-দু'ম করে সুদ্ব একটা চৌদ্দ পয়সার টিকিট লাগিয়ে না। বোন তা হলে এক খাতাতেই অনেকগুলো টিকিট পেয়ে যাবে।'

ততক্ষণে পল এসে আমার সঙ্গ নিয়েছে। আস্তে আস্তে শুধাল, 'সোকোটায় দ্বীপের কথা ওঠাতে আপনি কি ভাবছিলেন?'

আমি বললাম, 'অনেক কিছু।' এবং তার খানিকটা তাকে শুনিতে দিলাম।

পল দেখেছি পার্সির মতো সমস্তক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে মেতে থাকে না। মাঝে মাঝে জাহাজের এক কোণে বসে বই-টাই পড়ে। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে আমার কথাগুলো হজম করে নিয়ে বলল, বিষয়টা সত্যি ভারি ইনটেরেস্টিং। সমুদ্রে সর্ব প্রথম কে আধিপত্য করলে, তারপর কে, তারাই বা সেটা হারাল কেন, আজ যে মার্কিন আর ইংরেজ আধিপত্য করছে সেটাই বা আর কতদিন থাকবে? এবং তার পর আধিপত্য পাবে কে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'বোধ হয়, আফ্রিকার নিগেরা। ফিনিশিয়ান, গ্রীক, রোমান, ভারতীয়, চীনা, আরব, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি যাবতীয় জাতই তো পালা করে রাজত্ব করলে—একমাত্র ওরাই বাদ গেছে। এখন বোধ হয় ওদের পালা। আর ম্যাপে দেখছ তো, কী বিরাট মহাদেশ, ওতে কোটি কোটি লোক-চণ্ডা স্বাধীন স্ত্রী-পুরুষ গমগম করছে।'

পল বললে, 'কিন্তু ওদের বুদ্ধিমত্তি?'

আমি বললাম, 'সে তো দুই পুরুষের কথা। লেগে গেলে একশ বছরের ভিতর একটা জাত অন্য সব কটা জাতকে হারিয়ে দিতে পারে। বরঞ্চ পুরনো সভ্য জাত যারা আধমরা হয়ে গিয়েছে, তাদের নতুন করে বশিষ্ঠ প্রাণবন্ত করে রাজার আসনে বসানো কঠিন। একবার ছাঁচে ঢালানো করে যে মাল তৈরি করা হয়েছে তাকে ফের পিটে-ঠুকে নতুন আকার দেওয়া কঠিন—সেই তো হচ্ছে আজকের দিনের চীনা, ভারতীয় এবং আরো মেলা প্রাচীন জাতের নতুন সমস্যা।'

পল জিজ্ঞেস করলে, 'ভারতীয়েরাও এককালে সমুদ্রে রাজত্ব করেছে নাকি?'

আমি বললাম, 'সে-কথা আজ প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তাদের দোষ দেওয়া অনুচিত। কারণ, ভারতীয়েরা নিজেই সে ইতিহাসের সন্ধান রাখে না। অথচ আমার যতদূর জানা, তাতে তারা লাল দরিয়া থেকে চীনা সমুদ্র পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়াতে রাজত্বও করেছে। তার পর একদিন আমাদের সমাজপতিরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করে দিলেন খুব সম্ভব আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তার তারা পছন্দ করেননি। তাই হয়ত তারা বলতে চেয়েছিলেন, যে-দেশ জয় করছে তারই আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যাও, আপন দেশে ফিরে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।'

পল বললে, আমার জীবনের এই ঘোষণা বৎসর কাটল চীনে কিন্তু ভারতের সঙ্গে চীনের কখনো কোনো যোগ হয়েছিল বলে শুনিনি। শুধু শুনেছি বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে এসেছিল। কিন্তু সে তো কটমটে ব্যাপার।'

আমি বললাম, 'অতিশয়। ও পাড়া মাড়িয়ে না। কিন্তু চীন ভারতের মধ্যে একবার একটি ভারি চমৎকার মজাদার দোস্তি হয়েছিল। শুনবে?'

পল বললে, 'তা আর বলতে। কিন্তু পার্সিটা গেল কোথায়? কুকুর-ছানার মতো যেন সমস্তক্ষণ নিজের ল্যাজ খুঁজে বেড়ায়। ওরে, ও পার্সি!'



## জিরাফ-কাহিনী

দিল্লীতে যখন পাঠান-মোগল রাজত্ব করত তখন সামান্যতম সুযোগ পেলে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা করত। বাংলার প্রধান সুবিধে এই যে, সেখানে নদী-নালা বিল-হাওর বিস্তার এবং পাঠান-মোগলের আপন পিতৃভূমি কিংবা দিল্লীতে ও-সব জিনিস নেই বলেই তারা যখনই বিদ্রোহ দমন করতে এত বাংলার জল দেখত তখনই তাদের মুখে জল যেত শুকিয়ে। দেশটা পিছলে অভ্যাস না থাকলে দাঁড়ানো কঠিন।

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে বাংলার এক শাসনকর্তা স্বাধীন হয়ে রাত হয়ে যান। রাজ্যটি একটু খামখেয়ালী ছিলেন। তা' না হলে কোথায় ইরান আ কোথায় বাংলাদেশ! তিনি সেখানে দূত পাঠালেন বিস্তার দামী দামী সওগাত সঙ্গে নিয়ে ইরানের সব চেয়ে সেরা কবি হাফিজকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করার জন্য চিঠিতে লিখলেন, 'হে কবি, তোমার সুমধুর তথা উদাস কণ্ঠে তামাম ইরান দে ভরে গিয়েছে। ইরান ক্ষুদ্র দেশ, তোমার কণ্ঠস্থতির জন্য সেখানে আর স্থান নেই পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এখানে এস, তোমার কণ্ঠস্বর এখানে প্রচুর জায়গা পাবে।' তার সরল অর্থ, ইরানে আর কটা লোক তোমার সত্যকার কদর করতে পারবে? এ-দেশের লোকসংখ্যা প্রচুর। এইখানে চলে এস।

হাফিজের তখন বয়স হয়েছে। তাঁর বুড়ো হাড়-কথানা তখন আর দীর্ঘ ভ্রমণ আর দীর্ঘতর প্রবাসের জন্য দেশ ছাড়তে নারাজ। তাই কবি একটি সুন্দর কবিতা লিখে না আসতে পারার জন্য বিস্তার দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বাংলাদেশের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এ ঘটনার কেনো উল্লেখ নাই। এর ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে ইরানের খাতাপত্র থেকে।

তার পরের রাজার দৃষ্টি গেল সেই সুদূর চীনদেশের দিকে। কিন্তু চীন-সম্রাটকে তো আর বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করা যায় না। কাজেই রাজদূতকে বহু উত্তম উপঢৌকন দিয়ে চীনের সম্রাটকে বাংলার রাজার আনন্দ-অভিবাদন জানানলেন।

চীন-সম্রাট সুদূর বাংলাদেশের রাজার সৌজন্য ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে পরম আপ্যায়িত হলেন। চীন বিস্তারী দেশ। প্রতিদানে পাঠালেন আরো বেশী মূল্যবান উপঢৌকন। সে রাজা কিন্তু ততদিনে রাজার দেশে চলে গিয়েছেন।

বাংলার রাজা তখন ভাবলেন, চীনের সম্রাটকে আমি কি দিতে পারি যা তাঁর নেই। রাজদূতকে মনের কথা খুলে তাঁর উপদেশ চাইলেন। রাজদূতটি ছিলেন

১। এককালে বাংলাদেশে প্রচুর হাফিজ গড়া হত। এখনও কেউ কেউ নেত্র নাই বাহা হেরি বিধুর বদন, কণ্ঠ নাই, চাই শুনি ভ্রমণ গুজুন' 'সস্তাব শতক'-এর বাংলা অনুবাদ পড়েন। হাফিজের সবচেয়ে উত্তম বাংলা অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি যখন চীনে ছিলেন তখন চীনদেশের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস-অবিশ্বাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন। বললেন, 'চীনের বহু লোকের বিশ্বাস, গাছের চেয়ে উঁচু মাথাওয়া যে এক পয়মন্ত প্রাণী আছে সে যদি কখনো চীনদেশে আসে তবে সে দেশের শস্য তার-ই মাথার মতো উঁচু হবে।'

রাজা শুধালে, 'কি সে প্রাণী?'

রাজদূত বললেন, জিরাফ। আফ্রিকাতে পাওয়া যায়।'

রাজা বললেন, 'আনাও আফ্রিকা থেকে।'

যেন চাটখানি কথা! কোথায় বাংলাদেশ, আর কোথায় আফ্রিকা! আজ যে এই বিরাট বিরাট কলের জাহাজ দুনিয়ার সর্বত্র আনাগোনা করে তার-ই একটাতে জিরাফ পোরা কি সহজ! তখনকার দিনের পালের জাহাজে আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশ, সেখান থেকে আবার চীন-ক'মাস, কিংবা ক বছর লাগবে কে জানে? ততদিন তার জন্য ঐ অকূল দরিয়ায় ঘাস-পাতা পাবে কোথায়-দেখতে পাচ্ছি এই কলের জাহাজেই আমাদের শাক-সবজী সালাড খেতে দেয় অন্ন-তার অন্যান্য তদারকি কি সহজ?

তখনকার দিনে আরব কারবারীরা আফ্রিকা, সোকোত্রা, সিংহল হয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে যেত। রাজা হুকুম দিলেন, 'জিরাফ নিয়ে এস।'

জিরাফ এল। কি খেয়ে এল, কত দিনে এল, কিছুই বলতে পারব না। রাজা জিরাফ দেখে ভারী খুশী। হুকুম দিলেন, চীন-সম্রাটকে ভেট দিয়ে এস।'

সেই চীন! জাহাজে করে। কতদিন লাগলো কে জানে।

চীন-সম্রাট সংবাদ পেয়ে যে কতখানি খুশি হয়েছিলেন তার খানিকটো কল্পনা করা যায়। তিনি হুকুম দিলেন, প্রাণীর জন্য খুব উঁচু করে আস্তাবল বানাও।

বলা তো যায় না তার মুড়ুটা মেঘে ঠেকবে, না চাঁদে ঠোঁড় লাগাবে। দীর্ঘ ভ্রমণের পর জিরাফ যখন জিরিয়ে জুরিয়ে তৈরী তখন শুভদিন শুভক্ষণ দেখে, চীন-সম্রাট পাত্র অমাত্য সভাসদসহ শোভাযাত্রা করে জিরাফ দর্শনে বেরুলেন। সঙ্গে নিলেন, বিশেষ করে, রাজচিত্রকর এবং সভাকবি।

সম্রাট জিরাফ দেখে গভীর আনন্দ লাভ করলেন। সভাসদ ধন্য ধন্য করলেন। আপামর জনসাধারণ গভীরতর সম্ভাষণ লাভ করলো-তাদের গুরুজন বলেছি-লেন যে এ রকম অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, এবং সে একদিন চীনদেশে আসবে, সেটা কিছু অন্যায বলেন নি। যারা সন্দেহ করত তাদের মুড়ুগুলো এখন টেনে টেনে ঐ জিরাফের মুড়ুটার মতো উঁচু করে দেওয়া উচিত।

সম্রাট চিত্রকরকে আদেশ দিলেন, 'এই শুভদিবস চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তুমি এই জিরাফের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কন করো।'

ছবি আঁকা হল।

সম্রাট কবিকে আদেশ করলেন, 'তুমি এই শুভ অনুষ্ঠানের বর্ণনা ছন্দে বেঁধে ছবিতে লিখে রাখো।'

তাই করা হল।

গল্প শেষ করে বললুম, 'সে ছবির প্রিন্ট আমি কাগজে দেবেছি।' পল শুধালে, 'স্যার, আপনি কি চীনা ভাষা পড়তে পারেন?'

আমি বললুম, 'আদর্শই না। আমার এক বন্ধু চীনা শিখেছে সে ভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ার জন্য। জানো তো, আমাদের বহু শাস্ত্র এদেশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু চীনা অনুবাদে এখনও বেঁচে আছে। আমার বন্ধু বৌদ্ধশাস্ত্র খুঁজতে খুঁজতে এই অদ্ভুত কাহিনীর সাক্ষাৎ পায়। তারই বাংলা অনুবাদ করে, ছবিসুদ্ধ সেটা বাংলা কাগজে ছাপায়। তা না হলে বাংলাদেশের লোক কখনো এ কাহিনী জানতে পারতো না, কারণ বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে কোনো ইতিহাস বা দলিল-পত্র নেই।'

পার্সি বললে, 'কিন্তু স্যার এটা তো ইতিহাসের মতো শোনাচ্ছে না! এ যে গল্পকে ছাড়িয়ে যায়।'

আমি বললুম, 'কেন বৎস, তোমার মাতৃভাষাতেই তো রয়েছে, 'টুথ ইজ স্টেজিয়ার দ্যান ফিকশন'-সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ।'

এবং আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে—ঘটনার বর্ণনা মানুষকে গল্পের চেয়েও বেশী সজাগ করে না তুলতে পারে, সে ঘটনার কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিংবা বলবো, যে লোক ঘটনাটার বর্ণনা দিয়েছে সে সত্যকার ঐতিহাসিক নয়। আমার দেশে এ রকম কাঠখোঁটা ঐতিহাসিকই বেশী।

৬

কলরব, চিংকার, তারহরে আত্ননাদ! কি হল, কি হয়েছে? তবে কি জাহাজ বোম্বের্টে পড়েছে? বায়স্কোপে যে রকম দেখি, বোম্বের্টেরা দুহাতে দুই পিস্তল, দুপাটি দীতে ছোরা কামড়ে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ আক্রমণ করে? তারপর হঠাৎ কানের পর্দা ফাটিয়ে এক ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ—বরদ গোদামে আগুন লেগে সেটা ফেটে গিয়েছে। তারই আগুন জাহাজের দড়া-দড়ি পাল মাস্তুলে লেগে গিয়ে সমস্ত জাহাজ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

নাঃ! রপু। বাচলুম। সর্বাস্থ ঘামে ভিজে গিয়েছে। চোখ মেলতে দেখি, কেবিনের সব কটা আলো জ্বলছে। আর সামনে দাঁড়িয়ে পল আর পার্সি। পল দাঁড়িয়ে আছে সত্যি কিন্তু পার্সিটা জ্বলু না হটেনটট কি যেন এক বিকট আফ্রিকান নৃত্য জুড়েছে—আফ্রিকান—ই হবে, কারণ ঐ মহাদেশেরই গা ঘেঁসে তো এখন আমরা যাচ্ছি।

তা আফ্রিকার হটেনটটীয় মার্ভন্ড-ভান্ডর নৃত্যই হোক আর ইয়োরোপীয় মাংসুর্কা কিংবা ল্যামবেথ-উয়োক-ই হোক—আমি অবশ্য এ দুটোর মধ্যে

কোনো পার্থক্যই দেখতে পাইনে, সঙ্গীতে তো আদৌ না—পার্সি এ সময়ে আমার কেবিনে এসে বিন্-নোটিলে নাচ ছুড়বে কেন?

নাঃ, নাচ নয়। বেচারী উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করছে আর যে কাতর রোদন জানাচ্ছে সেটার 'সামারি' করলে দাঁড়ায়,—

'হায়, হায়, সব কিছু সাড়ে-সর্বনাশ হয়ে গেল, স্যার! আপনি এখনো অকাতরে নাক ডাকাচ্ছেন। আমার জীবন বিফল হল, পালের জীবনও বৃথাই গেল। জাহাজ রাতারাতি ডুব সত্যি কেটে জিবুটি বন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। সবাই জামা-কাপড় পরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে পারে নামবার জন্য তৈরী, আর আপনি,—হায়, হায়!'

(এই বইখানার যদি ফিল্ম হয় তবে এ স্থলে 'অশ্রুবর্ষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস')

আমি চোখ বন্ধ করলুম দেখে পার্সি এবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি শান্ত কণ্ঠে শুধালুম, 'জাহাজ যদি জিবুটি পৌঁছে গিয়ে থাকে তবে এখনো এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি কেন?'

পার্সি অসহিষ্ণুতা চাপাবার চেষ্টা করে বললে, 'এঞ্জিন বন্ধ করা, না করা তো এক মিনিটের ব্যাপার।'

আমি বললুম, 'নৌচরমণে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা বলে, এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পরও জাহাজ থেকে নামতে নামতে ঘন্টা দুয়েক কেটে যায়।'

পল, এই প্রথম মুখ খুললে, বললে, 'বন্দর যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'দার্জিলিং থেকে কাক্সনজঙ্ঘার চূড়োটা স্পষ্ট দেখা যায়, তাই বলে কি সেখানে দশ মিনিটে পৌঁছানো যায়?'

তারপর বললুম, 'কিন্তু এ সব কৃতর্ক। আমি হাতে-নাতে আমার বক্তব্য প্রমাণ করে দিচ্ছি।

তারপর অতি ধীরে সুস্থে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলুম। পল আমার কথা শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত কিন্তু পার্সি তখনো ব্যস্ত-সমস্ত। আমাকে তাড়া লাগাতে গিয়ে দাড়ি কামানো বুরশটা এগিয়ে দিতে গিয়ে তুলে ধরে দাঁতের বুরশ—এটে দিয়ে গাল ঘষলে মুখপোড়া হনুমান হতে কতক্ষণ—টাই ভেবে সামনে ধরে ডেসিং গাউনের কোমর বন্ধটা। তারপর চা-রসটি, মাখন-আভাতে অপূর্ব এক ঘ্যাট বানিয়ে আমার সামনে ধরে চতুর্দিকে ঘোরপাক খেতে লাগল—বাড়িতে জিনিসপত্র বীধাই-ছদাই করার সময় পাপিটা যে রকম এর পা ওর পার ভিতর দিয়ে ঘোরপাক খায় এবং বাড়িসুদ্ধ লোককে চটিয়ে তোলে।

শেষটায় বেগতিক দেখে আমি একটু তাড়াহড়ো করে সদলবলে ডেকে এলুম।

উপরে তখন আর সবাই অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে তাস, পাশা, গালগল্পে ফিরে গিয়েছে।

পল চোখে দূরবীন লাগিয়ে বললে, 'কই, স্যার বন্দর কোথায়? আমি তো

দেখতে পাচ্ছি, ধূ-ধূ করছে মরুভূমি আর টিনের বাস্তের মতো কয়েক সার একেঘেয়ে বাড়ি।

আমি বললুম, 'এর-ই নাম জিবুটি বন্দর।'

'ঐ মরুভূমিতে দেখবার মতো আছে কি?'

'কিছু না। তবে কি জানো ভিনদেশ পরদেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অত শত বাছবিচার করতে নেই—বিশেষত এই অল্প বয়সে। চিড়িয়াখানায় যখন ঢুকেছি, তখন বাঘ সিংহি দেখার সঙ্গে সঙ্গে খাটাশটাও দেখে নেওয়াই ভালো। আর কে জানে, কোন মোড় ঘুরতে কোন এক অপ্রত্যাশিত জিনিস বা অভিজ্ঞতা সম্ভব হবে না? মোকামে পৌছানোর পর না হয় জমা-খরচ করা যাবে, কোনটা ভালো লাগলো আর কোনটা লাগল না।'

জাহাজ থেকে তড় তড় করে সিঁড়ি ডেইলি ডায়ায় নামা যায় পৃথিবীর ভালো ভালো বন্দরেই। এখানে তাই পারে যেতে হল মোটর লঞ্চ করে। জিবুটির চেয়েও নিকৃষ্ট বন্দর পৃথিবীতে হয়তো আছে কিন্তু আমার দেখার মধ্যে ঐটেই সব চেয়ে অপ্রিয়দর্শন ও বৈচিত্র্যহীন বন্দর। মরুভূমির প্রত্যন্ত-ভূমিতে বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে একমাত্র রাজ্য বিস্তারের লোভে। এবং এ মরুভূমিকে কোনো প্রকারের শ্যামলিমা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জেনেই কেউ কোনো দিন কণামাত্র চেষ্টা করেননি। একে একটুখানি আরামদায়ক করার।

ডায়া থেকে সোজা চলে গিয়েছে একটা ধূলায় ভর্তি রাস্তা বন্দরের চৌক বা টিক মাঝখানে। তারপর সেখান থেকে এদিকে ওদিকে দু-চারটে রাস্তা গিয়েছে বটে কিন্তু বড় রাস্তাটা দেখার পর ও-সব গলিতে ঢোকান প্রবৃত্তি সুস্থ লোকের হওয়ার কথা নয়। বড় রাস্তার দুদিকে সাদা চুনকাম করা বাড়িগুলো এমনি মুখ গুমসো করে দাঁড়িয়ে আছে যে বাড়ির বাসিন্দারাও বোধ করি এ-সব বাড়িতে ঢোকান সময় দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুকনো ঢোক গেলে কিংবা বী হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকে নেয়। ছোট গলির মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখি, মাটির তৈরী দেয়াল ছাদের ছোট ছোট ঘর, না, ঘর নয়, গম্বুজ কিংবা গুহাও বলতে পারো। বৃষ্টি এদেশে এতই ছিটোফোঁটা হয় যে, ছাত গলে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। আর থাকলেই বা কি, এদেশে তো আর ঘাস-পাতা পড়ায় না যে তাই দিয়ে চাল বানাবে?

এর-ই ভিতরে মানুষ থাকে, মা ছেলেকে ভালোবাসে, ভাই ভাইকে স্নেহ করে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই হয়।

কিন্তু আমি এত আশ্চর্য হচ্ছি কেন? আমি কি কখনো গলির ঘিঞ্জি বস্তির ভিতর ঢুকি নি—কলকাতায়? সেখানে দেখিনি কী দৈন্য, কী দুর্দশা! তবে আজ এখানে আশ্চর্য হচ্ছি কেন? বোধ হয় বিদেশে এ জিনিস প্রত্যাশা করিনি বলে কিংবা দেশের দৈন্য দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি বলে বিদেশে তার অন্য রূপ দেখে চমকে উঠলুম।

এইখানেই মহামানব এবং হীনপ্রাণে পার্থক্য! মহাপুরুষরা দৈন্য দেখে

কখনো অভ্যস্ত হন না। কখনো বলেন না, এ তো সর্বত্রই হচ্ছে, অহরহ হচ্ছে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। দৈন্য তাদের সব সময়ই গভীর পীড়া দেয়—যদিও আমরা অনেক সময় তাঁদের চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারি নে। তারপর একদিন তারা সুযোগ পান, যে সুযোগের প্রতীক্ষায় তাঁরা বছরের পর বছর প্রহর গুনছিলেন, কিংবা যে সুযোগ তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আপন হাতে গড়ে তুলছিলেন, এবং এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী, গিরিদরী-তলে  
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি পরিপূর্ণ বলে

সেই মত বাহিরিলে, বিশ্বলোকে ডাবিলে বিশ্বয়ে যাহার পতাকা  
অধর আচ্ছন্ন করে এত কাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা।।"

তাই যখন হঠাৎ একদিন এক অরবিন্দ ঘোষ, এক চিত্তরঞ্জন দাশ এসে আমাদের মাঝখানে দেখা দেন তখন আমাদের আর বিশ্বয়ের অবশি থাকে না। আজন্ম, আশৈশব, অনটনমুক্ত বিলাসে জীবন যাপন করে হঠাৎ একদিন তাঁরা সবকিছু বিসর্জন করে গিয়ে দাঁড়ান গরীব দুঃখী, আতুর অভাজনের মাঝখানে। যে দৈন্য দেখে ভিতরে ভিতরে গভীর বেদনা পেতেন, সেই দৈন্য ঘুচাতে গিয়ে তাঁরা তখন পান গভীরতর বেদনা। কিন্তু সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই হবে।

"—তাই উঠে বাজি

জয়ন্ত তীর? তোমার দক্ষিণ করে

তাই কি দিশেন আজি কঠোর আদরে

দুঃখের দারুণ দীপ আলোক যাহার

জুলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আধার

ধ্রুব তারকার মতো। জয় তব জয়।"

কিন্তু এত সব কথা তোমাদের শোনাচ্ছি কেন? তার কারণ গত রাতে জাহাজে বসে আফ্রিকা মহাদেশ এবং বিশেষ করে যে সোমালি দেশের ভিতর জিবুটি বন্দর অবস্থিত তারই কথা ভাবছিলাম বলে। এবং এই সোমালিদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচাবার জন্য যে একটি লোক বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল তার কথা বার বার মনে পড়ছিল বলে।

ইউরোপীয় বর্বরতার চূড়ান্ত বিকাশ দেখতে হলে পড়তে হয় আফ্রিকার ইতিহাস—ইথরেজ শাসিত ভারতের ইতিহাস তার তুলনায় নগণ্য।

পর্তুগীজ, ইথরেজ, জার্মান, ফরাসী, বেলজিয়াম—কত বলব। ইয়োক্রোপীয় বহু জাত, কমজাত, বন্ধজাত এই আফ্রিকায় একদিন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্য বস্তিরের বর্বর পাশবিক ক্ষুধা নিয়ে, শকুনের পাল যে রকম মরা গোরুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভুল বললুম; শকুনিদের উপর অবিচার করা হল, কারণ তারা তো জ্যান্ত পশুর উপর কখনো ঝাঁপ দেয় না। এই ইয়োক্রোপীয়রা এসে ছেকে ধরলো সোমালি, নিগ্রো, বান্টু, হটেনটটদের। তাদের হাতে-পায়ে বেঁধে মুগীলাদাই ঝাঁকার মতো জাহাজ-ভর্তি করে নিয়ে গেল আমেরিকায়। কত লক্ষ নিগ্রো দাস

যে তখন অসহ্য যন্ত্রণায় মারা গেল তার নিদারুণ করুণ বর্ণনা পাবে 'আঙ্কল টমস্ ক্যাবিন' পুস্তকে—বইখানা পড়ে দেখো। ইংরিজী ভালো বুঝতে না পারলে বাংলা অনুবাদ 'টম্ কাকার কুটির' পড়লেই হবে—আমি ছেলেবেলায় বাংলাতেই পড়েছিলাম।

আর আফ্রিকার ভিতরে যা করলে তার ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিঁদ কল্পে একখানা বই লিখে এমনই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন যে তাঁর মতো দুঃসাহসী না হলে ঐ সম্বন্ধে কেউ আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায় না। আর লিখলেই বা কি, প্রকাশক পাবে না। প্রকাশক পেলেই বা কি? কাগজে কাগজে বেরবে তার বিরুদ্ধে রূঢ় মন্তব্য, অশ্লীল সমালোচনা। তখন আর কোনো পুস্তকবিক্রেতা তোমার বই তার দোকানে রাখবে না। তবু জেনে রাখা ভালো, এমন মহাজ্ঞানও আছেন যারা এ সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বই লেখেন, ছাপান, প্রকাশ করেন এবং লোকে সে সব পড়ে বলে দেশে অন্যায্য অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

সোমালি দেশের উপর রাজত্ব করতে এসেছিল বিস্তারিত জাতঃ তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে রইল ফরাসী, ইংরেজ ও ইতালীয়।

ব্রিটিশ-সোমালি দেশে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মুহম্মদ বিন আবদুল্লা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। নিরস্ত্র কিংবা ভাঙাচোরা বন্দুক আর তাঁর-ধনুক সজ্জিত সোমালিরা তাঁর চতুর্দিকে এসে জড়ো হল অসীম সাহস নিয়ে—ইয়োরোপীয় কামান মেশিনগানের বিপক্ষে। এদিকে ইতালীয় এবং ব্রিটিশ সোমালি দেশের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মারামারি, ওদিকে কিছু দুই দলই এক হয়ে গেলেন মোস্তা মুহম্মদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য।

দুই পক্ষেরই বিস্তারিত হার-জিত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোস্তাই ইয়োরোপীয়দের খেদিয়ে খেদিয়ে লাল-দরিয়ার পার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন। ইংরেজ তখন সোমালিদের উপর রাজত্ব করার আশা ছেড়ে দিয়ে সমুদপারে দুর্গ বানিয়ে তার-ই ভিতর বসে রইল লাল-দরিয়ার বন্দরগুলি বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

সারা সোমালি দেশে জয়ধ্বনি জোগে উঠল—সোমালি স্বাধীন। তখন ইংরেজ তাঁকে নাম দিল, 'ম্যাড মোস্তা' অর্থাৎ 'পাগলা মোস্তা', আমাদের গাঁধীকে যেরকম একদিন নাম দিয়েছিলেন, 'নেকড়ে ফকীর' অর্থাৎ 'উল্লস ফকীর'। হেরে যাওয়ার পর মুখ ভাঙানো ছাড়া করবার কি থাকে, বলো?

কিন্তু হায়, খুব বেশী বৎসর গেল না। ১৯১৪-১৮ এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপীয়রা অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা মেরে মানুষকে কাবু করার কৌশল শিখে গিয়েছে। তাই দিয়ে যখন আবার তারা হানা দিলে তখন মোস্তাকে সে সময়কার মতো পরাজয় স্বীকার করে আশ্রয় গ্রহণ করতে হল তিন দেশে।

মোস্তা সেই অনাদৃত অবস্থায় আবার সাধনা করতে লাগলেন স্বাধীনতা জয়ের নতুন সন্ধানে। কিন্তু হায়, দীর্ঘ বাইশ বৎসরের কঠিন যুদ্ধ, নিদারুণ

কষ্টসাধনে তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভেঙে গিয়েছে। শেষ পরাজয়ের এক বৎসর পর, যে-ভগবানের নাম শ্রবণ করে বাইশ বৎসর পূর্বে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমেছিলেন তাঁরই নাম শ্রবণ করে সেই লোকে চলে গেলেন যেখানে খুব সম্ভব সাদা-কালোর দন্দু নেই।

এই যে জিবুটি বন্দরে বসে বসে চোখের সামনে তাগড়া লম্বা জোয়ান সোমালিদের দেখছি, তারাও নাকি তখন চিংকার করে কেঁদে উঠেছিল।

বীরের কাহিনী থেকে আমরা উৎসাহ সঞ্চয় করবো, তা না হলে আমি এ দুঃখের কাহিনী তুললাম কেন? তার কারণ বুঝিয়ে বলার পূর্বে একটি কথা আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে চাই।

'ফরাসীরা বড় খারাপ, 'ইংরেজ চোরের জাত' এ রকম কথার কোনো অর্থ হয় না। ভারতবর্ষে বিস্তারিত পকেটমার আছে, তাই বলে কেউ যদি গাল দেয় 'ভারতবাসীরা পকেটমার' তা হলে অধর্মের কথা হয়। 'ইংরেজ জাত অত্যাচারী' এ-কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

তাই যখন অধর্ম অরাজকতা দেখি তখন সংগ্রাম বর্জন করে তদন্তেই অস্ত্রধারণ করা অনুচিত। বহু জাত বহু বার করে দেখেছে, কোনো ফল হয়নি, হিংসা আর রক্তপাত শুধু বেড়েই গিয়েছে।

তাই মহাত্মাজী অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। অহিংসা দিয়ে হিংসা জয় করতে হবে। এর চেয়ে মহৎ শিক্ষা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষ যদি তাই দিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-সংগ্রাম, লুণ্ঠন-শোষণ রুদ্ধ করতে পারে তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সে সর্বসভ্য জাতি বলে গণ্য হবে।

এবং শেষ কথা—সব চয়ে বড় কথা—

আমাদের যেন রাজ্যলাভ না হয়। এদের অন্যায্য আচরণ দেখে আমরা যেন সতর্ক হই। আমরা দু'শ বৎসর পরাধীন ছিলাম। পরাধীনতার বেদনা আমরা জানি। আমরা যেন কাউকে পরাধীন না করি।

৭

পল জিঙ্কস করলে, এক দৃষ্টে কি দেখছেন, স্যার? আমি ভো তেমন কিছু নয়নাভিরাম দেখতে পারছি নে।'

বললাম, 'আমি কিঞ্চিৎ শার্পস হোমস্‌গিরি করছি। ঐ যে লোকটা যাচ্ছে দেখতে পারছো? সে ঐ পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে এল তো? দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা 'ফ্রিজোর', তাই লোকটার ঘাড়ের দিকটা দেখে অনুমান করছিলাম, জিবুটি বন্দরের নাপিতদের কোন পর্যায়ে ফেলি?'

পার্সি বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার ঠিক মনে আছে। আমি তো ছল কাটাবার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন ঢুকে পড়ি।'

আমি বললুম 'তা পারো। তবে কিনা, মনে হচ্ছে, এ-দেশে কোদাল দিয়ে চুল কাটে।'

পার্সি বললে, 'কোদাল দিয়েই কাটুক, আর কান্ডে দিয়েই কামাক, আমার তো গত্যন্তর নেই।'

নাপিত ভায়া ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। আমি তাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলুম, পার্সির প্রয়োজনটা কি।

কিন্তু দোকানটা এতই ছোট যে, পল আর আমি সেখানে বসবার জায়গা পেলুম না। বারান্দাও নেই। পার্সিকে বললুম, তার চুল কাটা শেষ হলেই সে যেন বন্দরের চৌমাথার কাফেতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

চৌমাথায় একটি মাত্র কাফে। সব কটা দরজা খোলা বলে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, খন্দের গিস-গিস করছে। কিন্তু এইটুকু হাতের-তোলো-পরিমাণ বন্দর, এখানে মেলার গোরুর হাট বসলো কি করে?

ভিতরে গিয়ে দেখি, এ কি, এ যে আমাদের জাহাজেরই ডাইনিং রুম। খন্দের সব কজনই আমাদের অতিশয় সুপরিচিত সহযাত্রীর দল। এ বন্দর 'দেখা' দশ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় বলে, সবাই এসে জড়ো হয়েছেন ঐ একটি মাত্র কাফেতেই। তাই কাফে গুলজার। এবং সবাই বসেছেন আপন আপন টেবিল নিয়ে। অর্থাৎ জাহাজের ডাইনিং রুমে যে চারজন কিংবা ছজন বসেন এক টেবিল নিয়ে, ঠিক সেই রকম এখানেও বসেছেন আপন আপন স্তম্ভি নিয়ে।

এক কোণে বসেছে গুটিকয়েক লোক, উদাস নয়নে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে। জাহাজে এদের কখনো দেখিনি। আন্দাজ করলুম, এরাই তবে জিবুটির বাসিন্দা। জরাজীর্ণ বেশভূষা।

কিন্তু এসব পরের কথা। কাফেতে ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে এ দেশের মাছি। 'চোখে পড়ে' বাক্যটি শব্দার্থেই বললুম, কারণ কাফেতে ঢোকার পূর্বেই এক ঝাক মাছি আমার চোখে থাবড়া মেতে গেল।

কাফের টেবিলের উপর মাছি বসেছে আলপনা কেটে, 'বারের' কাউন্টারে বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, খন্দের পিঠে, হ্যাটে,—হেন স্থান নেই যেখানে মাছি বসতে ভয় পেয়েছে।

দু-গেলাস 'নিবু-পানি টেবিলে আসা মাত্রই তার উপরে, চুমুক দেবার জায়গায়, বসলো গোটা আষ্টক মাছি। পল হাত দিয়ে তাড়া দিতেই গোটা কয়েক পড়ে গেল শরবতের ভিতর। পল বললে, 'ঐ য় যা।'

আমি বললুম, 'আরেকটা অর্ডার দি?'

সবিনয়ে বললে, 'না স্যার; আমার এমনিতেই ঘিন-ঘিন করছে। আর পয়সা খরচা করে দরকার নেই।'

তখন তাকিয়ে দেখি, অধিকাংশ খন্দের গেলাসই পূরো ভর্তি।

ততক্ষণে ওয়েটার দুটি চামর দিয়ে গেছে। আমাদের চামর দুটি হাতে নিয়ে অন্য সব খন্দেরদের সঙ্গে কোরাসে মাছি তাড়াতে শুরু করলুম।

সে এক অপূর্ণ দৃশ্য! জন পঞ্চাশেক খন্দের যেন এক অদৃশ্য রাজাধিরাজের চতুর্দিকে জীবন-মরণ পণ করে চামর দোলাচ্ছে। ডাইনে চামর, বাঁয়ে চামর, মাথার উপরে চামর, টেবিলের তলায় চামর। আর তার-ই তাড়ায় মাছিগুলো যুথুড়ট কিংবা ছলছল হয়ে কখনো ঢোকে পলের নাকে, কখনো ঢোকে আমার মুখে। কথাবার্তা পর্যন্ত প্রায় বন্ধ। শুধু চামরের সাই-সাই আর মাছির ভনভন! রুশ-জার্মানে লড়াই!

মাত্র সেই চারটি খাস জিবুটি বাসিন্দে নিচ্চল নীরব। অনুমান করলুম, মাছি তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এবং মাছির সঙ্গে লড়নেওলা জাহাজ-যাত্রীর দলও তাদের গা-সওয়া। এরকম লড়াইও তারা নিত্য নিত্য দেখে।

তখন লক্ষ্য করলুম তাদের শরবত পানের প্রক্রিয়াটা। তারা চামর তো দোলায়ই না, হাত দিয়েও গেলাসের মুখ থেকে মাছি খেদায় না। গেলাস মুখে দেবার পূর্বে সেটাতে একটু মোলায়েম ঠোনা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মাছিগুলো ইঞ্চি তিনেক উপরে ওঠা মাত্রই গেলাসটি টুক করে টেনে এনে চুমুক লাগায়। ঘিনপিত এদের নেই।

পলও লক্ষ্য করে আমাকে কানে কানে শুধালে, 'এ লক্ষীছাড়া জায়গায় এ-সব লোক থাকে কেন?'

আমি বললুম 'সে বড় দীর্ঘ কাহিনী। অর্থাৎ এদের প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞেস কর তবে শুনবে, প্রত্যেকের জীবনের দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় কাহিনী।'

এ সংসারের সর্বত্রই এক রকম লোক আছে যারা রাতারাতি লক্ষপতি হতে চায়। খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-নোকরি, কোন কাজেই ওদের মন যায় না। অস্ত খাটে কে, অস্ত লড়ে কে?—এই তাদের ভাবখানা।

সিনেমায় নিচ্চ দেখেছ, হঠাৎ খবর রটলো আফ্রিকার কোথায় যেন সোনা পাওয়া গিয়েছে, সেখানে মাটির উপর-নিচে সর্বত্র তাল তাল সোনা পড়ে আছে আর অমনি চললো দলে দলে দুনিয়ার লোক—সেই সোনা যোগাড় করে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য। সিনেমা কত রঙ-চঙেই না সে দৃশ্য দেখায়! অনাহারে ভ্রম্য পড়ে আছে, এখানে মড়া সেখানে মড়া। কোনো কোনো জায়গায় বাপ-মা, বেটা-বেটা চলেছে এক ভান্স গাড়িতে করে—ছেলেটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, মেয়েটা ভিরমি গেছে। বাপ টিনের ক্যানাস্তারা হাতে করে দুকতে দুকতে জল খুঁজতে গিয়ে এ পাথরে টক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ও পাথরে টোকার খেয়ে জখম হচ্ছে। মায়ের চোখে জলের কণা পর্যন্ত নেই—যেন অসাড় অবশ হয়ে গিয়েছে।

এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে, এরা এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া উপায় নেই। থামলে অবশ্যাবী মৃত্যু এগুলো বাঁচাতেও পারো।

কজন পৌছয়, কজন সোনা পায়, তার ভিতর কজন জনসমাজে ফিরে এসে সে ধন ভোগ করতে পারে, তার কোনো সরকারী কিংবা বে-সরকারী সেনসাস কখনো হয় নি। আর হলেই বা কি? যাদের এ ধরনের নেশা জনজাত তাদের ঠেকাবে কোন্ আদমশুমারী?



কিংবা হয়তো এদেরই একজন লেগে গেল কোম্পানি বানিয়ে, শেয়ার বিক্রি করে টাকা তুলতে। কেন? কোন এক বোরেটে কাঙান কোন এক অজানা দীপে কোটি কোটি টাকার ধন নিয়ে উধাও হয়ে যায় সেই দীপ খুঁজে বের করতে হবে, সেই ধন উদ্ধার করে রাতারাতি বড়লোক হতে হবে। সেই সমুদ্রে ঐ দীপটায় থাকার কথা সেখানে যাত্রী-জাহাজ বা মাল-জাহাজ কিছুই যায় না। সে দীপে নাকি খাবার জল পর্যন্ত নেই। ঐ বোরেটে কাঙান নাকি জলতৃষ্ণায় মারা গিয়েছিল আরো কত রকম উড়ো খবর।

যে কোম্পানি খুললে, সে বলে বেড়াচ্ছে তার কাছে ম্যাপ রয়েছে ঐ দীপে যাবার জন্য। সাধারণ লোক বলে, 'কই ম্যাপটা দেখি।' লোকটা বলে, 'আদার! তারপর তুমি টাকাটা মেঝে দাও আর কি?' কিন্তু রাতারাতি বড়লোক হওয়ার দল অতশত শূন্য না। তারা কোম্পানির শেয়ারও কেনে না-পয়সা থাকলেও কেনে না। তারা গিয়ে কান্নাকাটি লাগায় লোকটার কাছে-খালসী করে, বাবুচি করে আমাদের নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। তখন মাইনে কিছু চাইনে।' কান্তেনও ঐ রকম লোকই খুঁজছে,—শক্ত তাগড়া জোয়ান, মরতে যারা ডরায় না।

তারপর একদিন সে জাহাজ রওয়ানা হল। কিন্তু আর ফিরে এল না।

কিংবা ফিরে এল মাত্র কয়েক জন লোক। কিছুই পাওয়া যায়নি বলে এরা তাকে খুন করেছে। তখন লাগে পুলিশ তাদের পিছনে। মোকদ্দমা হয়, আরো কত কি?

পল কাকের সেই চারিটি জিবুটিবাসীর দিকে তাকিয়ে ফিস-ফিস করে আমাকে শুধালে, 'এরা সব ঐ ধরনের লোক?'

আমি বললুম, 'না, তবে ওদের বংশধর। বংশধর অর্থে ওদের ছেলে নাতি নয়, কারণ ও-ধরনের লোক বিয়ে-প্রা বড় একটা করে না। 'বংশধর', বলছি, এরা ঐ দলেরই লোক, যারা রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। কিন্তু আজকের দিনে তো আর সোনা পাওয়ার গুজোব ভাল করে রটতে পারে না,—তার আগেই খবরের কাগজওয়ালা প্রেন ভাড়া করে সব কিছু তদারক করে জানিয়ে দেয়, সমস্তটা ধান্না কিংবা জাহাজ ভাড়া করার কথাও ওঠে না। প্রেনে করে ঝটপট সব-কিছু সারা যায়। হেলিকপ্টার হওয়াতে আরো সুবিধে হয়েছে। একেবারে মাটির গা ছুঁয়ে ভালো করে সব কিছুই তদারক করা যায়।'

তাই এরা সব করে অফিচ চালান, কিংবা মনে করো, কোনো দেশে বিদ্রোহ হয়েছে—বিদ্রোহীদের কাছে বে-আইনী ভাবে বন্দুক-মেশিনগান ইত্যাদি বিক্রি।

যখন কিছুতেই কিছু হয় না, কিংবা সামান্য যে টাকা করেছিল তা ফুঁকে দিয়েছে, ওদিকে বয়সও হয়ে গিয়েছে গায়ে আর জোর নেই, তখন তারা জিবুটির মতো লক্ষ্মীছাড়া বন্দরে এসে দু'পয়সা কামাবার চেষ্টা করে, আর নতুন নতুন অসম্ভব আডভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখে। জিবুটির মতো অসহ্য গরম আর যারো এক রোগ-ব্যাধির ভিতরে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কাজের সন্ধানে আসবে? কিন্তু এদের আছে কষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাই এদের জন্য এখানে কিছু

একটা জুটে যায়। এই যেমন মনে করো, এখান থেকে যে রেললাইন শুরু হয়ে আবিসিনিয়ার রাজধানী আদিস-আবাবা অবধি গিয়েছে—প্রায় পাঁচ শ মাইলের দাক্ষা-সে লাইনে তো নানা রকমের কাজ আছেই, তার উপর ওরই মালফতে ব্যবসা-বাণিজ্য যা হবার তা-ও হয়। ঐ সব করে, আর একে অন্যকে আপন আপন যৌবনের দুঁদেমির গল্প বলে।

পাছে পল ভুল বোঝে তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'কিন্তু এই যে চারটি লোক বসে আছে, ঠিক এরাই যে এ ধরনের আডভেঞ্চারের সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে—ঐটুকু যা কথা।

ইতিমধ্যে মুখে একটা মাছি ঢুকে যাওয়াতে বিস্ময় খেয়ে কাশতে আরম্ভ করলুম। শান্ত হলে পর পল শুধালে, 'এদের কথা শুনে এদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত, না অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

আমি অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানো? কেউ যখন করুণার সন্ধান করে তখনই প্রশ্ন জাগে, এ লোকটা করুণার পাত্র কিনা? কিন্তু এরা তো কারো তোয়াক্কা করে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরা আশা রাখে, স্বপ্ন দেখে, রাস্তার মোড় ঘুরতেই নদীর বাঁক নিতেই সামনে পাবে পরীস্থান যেখানে গাছের পাতা রূপোর, ফল সোনার, যেখানে শিশিরের ফোঁটাতে হাত দিলেই তারা হীরের দানা হয়ে যায়, যেখানে—'

আরেকটুখানি কবিত্ব করার বাসনা হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যে পার্সি মাছি তাড়াতে তাড়াতে এসে উপস্থিত। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাখলো ও-দ্য-কলনের এক টাউস বোতল। মুখে হাসি, চোখে খুশি-বোতলের নয়, পার্সির।

আমি বোতলটা হাতে নিয়ে দেখি, দুনিয়ার সব চাইতে ডাকসাইটে ও-দ্য-কলন-থাস কলন শহরের তৈরী কলনের জল- Eau de Cologne 4711 মার্ক।

পার্সি বললে, 'দাঁও মেরেছি স্যার। বলুন তো এর দাম বোঝাই কিংবা লভনে কত?'

আমি বললুম 'শিলিং বারো চৌদ্দ হবে।'

লক্ষ্য জয় এবং সীতাকে উদ্ধার করেও বোধ হয় রামচন্দ্রী এতখানি পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন নি। তবু হনুমান কি করেছিলেন তার খানিকটে আভাস পেলুম, পার্সির বুক চাপড়ানো দেখে।

'তিন শিলিং, স্যার, তিন শিলিং! সব মাত্র, কুলে, জস্ট, তিন শিলিং! নট, এ পেনি মোর, নট ইভন এ রেড ফার্ডিং মোর।'

এ সময় দেখি, কাকের আরেক কোণ থেকে সেই আবুল-আসফিয়া-কি কি যেন—সিদ্দিকী সায়েব তার সেই লম্বা কোট আর ঝোলা পাতলুন পরে আমাদের দিকে আসছেন। ইনি আমাদের সেই বন্ধু যিনি সবাইকে লাইমজুস, চকলেট খাওয়ান—কিন্তু যার কল্পসি কথা কওয়াতে।

আমরা উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি বসেই বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তাররা যে রকম একসরে 'র' প্রেট দেখে সেই রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

পার্সি পুনরায় মৃদু হাস্য করে বললে, 'একদম খাঁটি জিনিস।'

আবুল আসফিয়া মুখ বন্ধ রেখেই নাক দিয়ে বললেন, 'হু।'

তারপর অনেকক্ষণ পরে অতি অনিচ্ছায় মুখ খুলে শুধালেন, 'ওটা কার জন্য কিনলে?'

'পার্সি বললে পিসিমার জন্য।'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'বোতলটার ছিপি না খুললে বিলেতে নামবার সময় তোমাকে প্রচুর কাষ্টমসের ট্যাক্স দিতে হবে। এমন কি এ জাহাজে ওঠার সময়ও—তবে সে আমি ঠিক জানিনে।'

পার্সি আমার দিকে তাকালে।

আমি বললুম, 'ছিপি খোলা থাকলে ওটা তোমার আপন ব্যবহারের জিনিস হয়ে গেল; তাই ট্যাক্স দিতে হয় না।'

অনেকক্ষণ পর আবুল আসফিয়া বললেন, 'যখন খুলতেই হবে তখন এই বেলা খুলে ফেলাই ভালো।'

আমরা সবাই—পার্সিও—বললুম, 'সেই ভালো।'

ওয়েটার একটা কর্ক হু নিয়ে এল। আবুল আসফিয়া পরিপাটি হাতে বোতল খুলে প্রথম কর্কটার ভিতরের দিক শুকলেন, তারপর বোতলের জিনিস।

একটু ভেবে নিয়ে আমাদের শৌকালেন।

কোনো গন্ধ নেই।

যেন জল—প্রেন, 'নির্জলা' জল।

পার্সি তো একেবারে হতভম্ব। অনেকক্ষণ পর সামনে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু ছিপি, সীল সবই তো ঠিক?'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'এ সব ছোট বন্দরে পুলিশের কড়াঙ্কড়ি নেই বলে নানা রকমের লোক অনেক অজানা প্রক্রিয়ায় আসল জিনিস সরিয়ে নিয়ে মেকি কিংবা প্রেন জল চালায়।'

আমি পলকে কানে কানে বললুম, 'হয়তো আমাদেরই একজন 'এ্যাডভেঞ্চারার'।'

পালের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, খাস জিবুটি—বাসিন্দারা দরদ-ভরা আখিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অনুমান করতে বেগ পেতে হল না, এরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

পার্সিও খানিকটা বুঝতে পেরেছে। বলল, 'যাত্রীরা বোকা কিনা, তাই এ শয়তানিটা তাদের উপরই করা যায়। আর প্রতি জাহাজেই আসে এক জাহাজ—'

পল বাধা দিয়ে বললে, 'পার্সি!'

পার্সি চটে উঠে বললে 'ওঃ আর উনিই যেন এক মহা কন-ফু-ৎস।'

জাহাজে ফেরার সময়, আবুল আসফিয়াকে একবার একা পেয়ে শুধালুম, 'ছোড়াটাকে বড় নিরাশ করলেন।'

বললেন, 'উপায় কি? না হলে প্রতি বন্দরে মার খেতে যো।'

৮

গুণীরা বলেন, অগ্র-পচাৎ বিবেচনা করে কথা বলবে।

জিবুটি ত্যাগ করার সময় পার্সি বন্দরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'লক্ষীছাড়া জায়গাটা।' ও-দা কলনের খেদটা তখনো তার মন থেকে যায় নি। তাই অগ্র-পচাৎ বিবেচনা না করেই কথাটা বললো।

যদ্দা খানেকের ভিতর উঠল ঝড়। তেমন কিছু মারাত্মক নয় কিন্তু 'সী সিকনেস' দিয়ে মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পার্সিই প্রথম বিছানা নিল বমি করতে করতে তার মুখ তখন সরষে ফুলের রঙ ধরেছে। ভাঙা গাল দুটো দেখে মনে হয় সত্তর বছরের বুড়ো।

আমি নিজে যে খুব সুস্থ অনুভব করছিলাম তা নয়, তবু পার্সিকে বললুম, 'তবে যে, বৎস জিবুটি বন্দরকে কটু-কাটব্য করছিলে? এখন ঐ লক্ষীছাড়া বন্দরেই পা দিতে পারলে যে দু মিনিটেই চাক্ষু হয়ে উঠতে। মাটিকে তাক্ষিয়া করতে নেই—অস্তুত যতক্ষণ মাটির থেকে দূরে আছ—তা সে জলর তলাতে সাবমেরিনেই হোক, উপরে জাহাজেই হোক, কিংবা তারো উপরে বাতাসে ভর করে অ্যারোপ্লেনেই হোক। তা সে যাক গে। এখন বুঝতে পারলে গুণীরা কেন বলেছেন, অগ্র-পচাৎ ইত্যাদি?'

পার্সি কিন্তু তৈরী ছেলে। সেই ছটফটানির ভিতর থেকে কাতরাতে কাতরাতে বললে, 'কিন্তু এখন যদি কোনো ডুবন্ত ধীপের মাটিতে ধাক্কা লেগে জাহাজখানা চৌচির হয়ে যায় তখনো মাটির গুণগান করবেন নাকি?'

আমি বললুম, 'ঐ য় যা। এতখানি ভেবে তো আর কথাটা বলি নি।'

পল তার খাটে বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। আন্তে আন্তে বললে, 'জাহাজ যদি মাটিতে লেগে চৌচির হয়ে যায় তবে তো সেটা মাটির দোষ নয়। জাহাজ জোরের সঙ্গে ধাক্কা দেয় বলেই তো খানখান হয়ে যায়। আন্তে আন্তে চললে মাটির বাধা পেয়ে জাহাজ বড় জোর দাঁড়িয়ে যাবে—ভাঙবে কেন? মা'কে পর্যন্ত জোরে ধাক্কা দিলে চড় যেতে হয়, আর মাটি দেবে না?'

আমি উল্লাসিত হয়ে বললুম, 'সাধু সাধু! তুলনাটি চমৎকার। তবে কি না আমার দুঃখ, বাঙলা ভাষায় এ নিয়ে যে শব্দ দুটো আছে তার puni তোমরা বুঝবে না। মা হচ্ছেন 'মাদার' আর 'মাটি' হচ্ছেন 'দি মাদার' কিংবা 'আর্থ'।'

পল বললে, 'বিলক্ষণ বুঝেছি 'Good Earth!'

পার্সি বিরক্ত হয়ে বললে, 'পালের তুলনাটা নিশ্চয়ই চোরাই মাল।'

আমি বললুম, 'সাধুর টাকাতো দু সের দুধ, চোরের টাকাতোও দু সের দুধ। টাকার দাম একই। তুলনাটা ভালো। তা সে পলের আপন মালই হোক আর চোরাই মালই হোক। তা সে কথা থাক। তুমি কিন্তু 'সী সিকনেসে' কাতর হয়ে ভয় পেয়ো না। এ ব্যামোতে কেউ কখনো মারা যায় নি!'

পার্সি চি চি করে বললে, 'শেষ ভরসাটাও কেড়ে নিলেন, স্যার? আমি তো ভরসা করেছিলাম আর বেশীক্ষণ ভুগতে হবে না, মরে গিয়ে নিষ্কৃতি পাবো।'

পল বললে, 'আগাছা সহজে মরে না।'

আমি বললাম, 'থাক, থাক। চলো পল, উপরে যাই। আমরা তিনজনা মিলে 'সী সিকনেস' কে বডড বেশী লাই দিচ্ছি।'

পল বেরতে বেরতে বলল, 'হক কথা। পার্সির সঙ্গে একা পড়লে যে কোনো ব্যামো বাপ-বাপ করে পালাবার পথ পাবে না।'

উপরে এসে দেখি, আবুল আসফিয়া কোথা থেকে এক জোরদার দূরবীন যোগাড় করে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। এ সব জাহাজ কখনো পাড়ের গা ঘেঁষে চলে না। তাই জোরালো দূরবীন দিয়েও বিশেষ কিছু দেখা যায় না। পল আমাকে শুধালে, 'কি দেখেছেন উনি?'

আমি বললাম, 'আবুল আসফিয়া মুসলমান এবং মনে হচ্ছে ধর্মে তাঁর অনুরাগও আছে। লাল দরবার এক পারে সোমালি-ভূমি, হাবসী মুহুক এবং মিশর, অন্য পারে আরব দেশ। মহাপুরুষ মুহম্মদ আরবদেশে জন্মেছিলেন, ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। মক্কা মদীনা, সবই তো ঐখানে।'

পল বললে, 'ইংরিজীতে যখনই কোনো জিনিসের কেন্দ্রভূমির উল্লেখ করতে হয় তখন বলা হয়, যেমন ধরুন 'সঙ্গীতের বেলায়, 'ভিয়েনা ইজ দি মেক্কা অব মিউজিক'—এ তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু বিশেষ করে মক্কা বল হয় কেন? মক্কা তো আর তেমন কিছু বড় শহর নয়।'

আমি বললাম, 'পৃথিবীতে গোটা তিনেক বিশ্বধর্ম আছে, অর্থাৎ এ ধর্মগুলো যে দেশে জনগ্রহণ করেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন মনে করো বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম। কিন্তু পৃথিবীর বহু বৌদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টান কোনো বিশেষ পূর্ণ্যদিবসে এক বিশেষ জায়গায় একত্র হয় না—মুসলমানরা যে রকম হজ্জের দিনে মক্কায় একত্র হয়। কোথায় মরক্কো, কোথায় সাইবেরিয়া আর কোথায় তোমার চীন—পৃথিবীর যে সব দেশে মুসলমান আছে সে সব দেশের লোককে সেদিন তুমি মক্কায় পাবে। শুনেছি, সেদিন নাকি মক্কার রাস্তায় দুনিয়ার প্রায় সব ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়।'

'তাতে করে লাভ?'

আমি বললাম, 'লাভ মক্কাবাসীদের নিশ্চয়ই হয়। তীর্থযাত্রীরা যে পরিশ্রম খরচ করে তার সবই তো ওরা পায়। কিন্তু আসলে সে উদ্দেশ্য নিয়ে এ—প্রথা সৃষ্টি হয় নি। মুহম্মদ সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে পৃথিবীর সব দেশের মুসলমানকে যদি একত্র করা যায় তবে তাদের ভিতর একা এবং ভ্রাতৃত্বাব বাড়াবে। আমরা যখন বাড়িতে উপাসনা না করে গির্জায় কিংবা মসজিদে যাই তখন তারও তো অন্যতম উদ্দেশ্য। আপন ধর্মের লোকের সঙ্গে এক হওয়া। মুহম্মদ সাহেব বোধ হয় এই জিনিসটাই বড় করে, সমস্ত পৃথিবী নিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

পল অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, 'আমরা তো বড় দিনের পরবে প্রহু যীশুর

জন্মস্থল বেথলেহেমে জড়ো হই নে। হলে কি ভালো হত না? তা হলে তো খ্রীষ্টানদের ভিতরও একা সখা বাড়তো।'

আমি আরো বেশী ভেবে বললাম, 'তা হলে বোধ হয় রোমে পোপের প্রধান্য ক্ষুণ্ণ হত।'

কিন্তু থাক এসব কথা। আমার কোনো ক্যাথলিক পাঠক কিংবা পাঠিকা যেন মনে না করেন যে আমি পোপকে শ্রদ্ধা করিনি। পৃথিবীর শত শত লক্ষ লক্ষ লোক যাকে সম্মানের চোখে দেখে তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই শত লক্ষ লক্ষ লোককে অশ্রদ্ধা করা হয়। অতটা বেয়াদব আমি নই। বিশেষত আমি ভারতীয়। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, সব ধর্মকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

৯

ঝড় থেমেছে। সমুদ্র শান্ত ঝড়ের পর বাতাস বয় না বলে অসহ্য গরম আর গুমোট। এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই কি প্রকারে?

নিষ্কৃতির জন্য মানুষ ডাঙায় যা করে, জলে অর্থাৎ জাহাজেও তা-ই। একদল লোক বুদ্ধিমান। কাজে কিংবা অকাজে এমনি ডুব মারে যে, গরমের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেকখানি অচেতন হয়ে যায়। বোকার দল শুধু ছটফট করে। ক্ষণে এটা করে, ক্ষণে ওটা নাড়ে, ক্ষণে ঘুমাবার চেষ্টা করে, ক্ষণে জেগে থাকতে গিয়ে আরো বেশী কষ্ট পায়।

জাহাজেও তাই। একদল লোক দিবা-রাত্রি তাস খেলে সকাল-বেলাকার আঙা-কুটি খেয়ে সেই যে তারা তাসের সায়াতে ডুব দেয়, তারপর রাত-বারোটা-একটা-দুটো অবধি তাদের টিকি টেনেও সে সায়াত থেকে তোলা যায় না। লাক্ষ সাপার খেতে যা দু-একবার তাস ছাড়তে হয়, বাস্—ঐ। তখন হয় বলে 'কী গরম', নয় ঐ তাসের জেরই খানার টেবিলে টানে। চার ইঞ্চাপন না ডেকে তিন বে-তরুণ বললে ভালো হত, পুনরপি ডবল না বলে সে কি আহামুকই না করেছে।

জাহাজের বে-সরকারী ইতিহাস বলে, একটানা ছত্রিশ ঘন্টা তাস খেলেছে এমন ঘটনাও নাকি বিরল নয়। এরা গরমে কাতর হয় না, শীতেও বেকাবু হয় না। ভগবান এদের প্রতি সদয়।

দাবাখেলার চর্চা পৃথিবীতে ক্রমেই কমে আসছে। আসলে কিন্তু দাবাডোই এ ব্যাপারে দুনিয়ার আর সবাইকে মাত করতে পারে। দাবাখেলায় যে মানুষ কি রকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। 'পরশুরাম' লিখেছেন এক দাবাডোকে যখন চাকর এসে বললে, 'চা দেব কি করে?—দুধ ছিড়ে গেছে' তখন দাবাডো খেলার নেশায় বললে, 'কি ছালা, সেলাই করে নে না।'

আরেক দল শুধু বই পড়ে। তবে বেশীর ভাগই দেখেছি, ডিটেকটিভ উপন্যাস। ভালো বই দিবা-রাত্রি পড়ছে এ রকম ঘটনা খুব কমই দেখেছি।



আরেক দশ মারে আডডা। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে—আডডার যেটা প্রধান 'মেনু'—পরিন্দা, পরচর্চা। সেগুলো বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পাছে কোনো পাঠক ফস করে শুধায়, 'এগুলো আপনি জানলেন কি করে, যদি নিজে পরিন্দা না করে থাকেন? তাই আর বললুম না।'

আরো নানা গুণ্ডি নানা সম্প্রদায় আছে, কিন্তু আবুল আসফিয়া কোনো গোয়েই পড়েন না। তিনি আডডাবাজদের সঙ্গে বসেন না বাটে, কিন্তু আডডা মারেন না—খেয়া—নৌকার মাঝি যে রকম নদী পেরয়, কিন্তু ওপারে নাবে না। একথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু আজ হঠাৎ তাকে দেখি অন্য রূপে। খুলে কই।

পার্সি সেরে উঠে আবার জাহাজময় লম্প-বন্ধ লাগিয়েছে। যেখানেই যাই সেখানেই পার্সি। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, তবে কি পার্সির জন আট্টেক যমজ তাই আছে নাকি? একই লোক সাত জায়গায় এক সঙ্গে থাকবে কি করে?

সে—ই খবরটা আনলে।

কি খবর?

জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পৌঁছানোর পর ঢুকবে সুয়েজ খালে। খালটি একশ' মাইল লম্বা। দু-পাড়ে মরুভূমির বাণু বলে জাহাজকে এগতে হয় ঘন্টায় পাঁচ মাইল বেগে। তাহলে লম্প প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘন্টা খালের এ-মুখে সুয়েজ বন্দর, ও-মুখে সইদ বন্দর। আমরা যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে ট্রেন ধরে কাইরো চলে যাই এবং পিরামিড দেখে সেখান থেকে ট্রেন ধরে সইদ বন্দর পৌঁছাই, তবে আমাদের আপন জাহাজই আবার ধরতে পারবো। যদিও আমরা মোটামুটি একটা ত্রিমূর্তি দুই বাহু পরিভ্রমণ করব—আর সুয়েজ খাল মাত্র এক বাহু—তবু রেলগাড়ী তাড়াতাড়ি যাবে বলে আমরা কাইরোতে এটা ওটা দেখবার জন্য ঘন্টা দশেক সময় পাবো।

কিন্তু যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে সময় মত ট্রেন না পাই, কিংবা যদি কাইরো থেকে সময়মত সইদ বন্দরের ট্রেন না পাই আর সেখানে জাহাজ না ধরতে পারি, তখন কি হবে উপায়?

পার্সি অসিফু হয়ে বললে, 'সে তো কুক কোম্পানির জিমাদারি। তারাই তো এ টুর—না একস্কার্শন, কি বলবো—বন্দোবস্ত করেছে। প্রতি জাহাজের জন্যই করে। বিস্তর লোক যায়। চলুন না, নোটিশ বোর্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি—কুকের বিজ্ঞাপন।'

ত্রিমূর্তি সেখানে গিয়ে সাতিশয় মনোযোগ সহকারে প্রস্তাবটি অধ্যয়ন করলুম।

কিন্তু প্রস্তাবটির শেষ ছত্র পড়ে আমাদের আক্কেল গুড়ুম নয়, দড়াম করে কেটে গেল। এই একস্কার্শন—বন-ভোজ কিংবা শহর-ভোজ, যাই বলে, যাচ্ছি তো কাইরো 'শহরে'—যাঁরা করতে চান তাঁদের প্রত্যেককে দিতে হবে সাত পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় একশ' টাকা। পল বললে, 'হরি, হরি' (অবশ্য ইংরিজিতে 'গুড হেডেনস', 'মাই গুডেনস' এই জাতীয় কিছু একটা)। এত টাকা যদি আমার থাকবেই তবে কি আমি এই জাহাজে ফাস্ট ক্লাসে যেতুম না?

আমি বেদনাতুর হওয়ার তান করে বললুম 'কেন ভাই, আমরা কি এতই ধারাপ লোক যে আমাদের এড়াবার জন্য ভূমি ফাস্ট ক্লাসে যেতে চাও?'

পল তো লজ্জায় লাল হয়ে তোতলাতে আরম্ভ করলে।

আর পার্সি? সে তো হনুমানের মতো চক্রাকারে নৃত্য করে বলতে লাগল, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। করো মন্তরা স্যারের সঙ্গে। বোঝো ঠাণ্ডা।'

আমি বললুম, 'বাস্, বাস্। হয়েছে। হয়েছে। কিন্তু পার্সি, একশ' টাকা তো চাট্রিখানি কথা নয়। আমাকেই তো টাল-মাটাল হয়ে টাকাটা টেনতে হবে।'

পার্সিকে দমানো শক্ত। বললে, 'অপরাধ নেবেন না, স্যার, কিন্তু আমি—ই বা কোন হেনরী ফোর্ড কিংবা মিডাস্ রোটশিলট? কিন্তু আমি মনস্থির করেছি, আমার জেবের শেষ পেনি দিয়ে আমি পিরামিড দেখবই দেখব। চীনা দেওয়াল দেখার পর পিরামিড দেখব না আমি? মুখ দেখাবো তা হলে কি করে? তার চেয়েও ধারাপ, আয়নাতে নিজেরই মুখ দেখব কি করে?'

অনেক আলোচনা, বিস্তর গবেষণা করা হল। শেষটায় স্থির হল, পিরামিড—দর্শন আমাদের কপালে নেই। গালে হাত দিয়ে যখন ত্রিমূর্তি আপন মনে সেই শোক ডোলাবার চেষ্টা করছি এমন সময় আবুল আসফিয়া মুখ খুললেন।

তার সনাতন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি আমাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। ভালো মন্দ কিছুই বলেন নি। আমরা যখন স্থির করলুম, আমরা ট্রিপটা নেব না তখন তিনি বললেন, 'এর চেয়ে সস্তাতেও হয়।'

আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে শুধালুম, 'কি করে? কি করে?' বললেন, 'সে কথা পরে হবে।'

তারপর আপন চেয়ার ছেড়ে খানা-কামরার দিকে চলে গেলেন।

১০

পল আর পার্সিকে এখন আর বড় একটা দেখতে পাইনে। ওরা আবুল আসফিয়ার কোটের উপর ডাক-টিকিটের মতো সেঁটে বসেছে—ছিনে জৌকের মতো সেগে গেছে বললে কমিয়ে বলা হয়, কারণ রক্ত শোষা শেষ হলে তবু ছিনে জৌক কামড় ছাড়ে—এরা খামের উপর ডাকটিকিটের মতো, যেখানেই আবুল আসফিয়া দেখানোই তারা। মুখে এক বুলি, এক প্রশ্ন—কি করে সস্তায় কাইরো গিয়ে সেখানে থেকে সস্তাতেই ফের সইদ বন্দরে জাহাজ ধরা যায়? আবুল আসফিয়া বলেন, 'হবে, হবে সময় এলে সবই হবে।'

শেষটায় জাহাজ যেদিন সুয়েজ বন্দরে পৌঁছাবে তার আগের দিন তিনি রহস্যটি সমাধান করলেন। অতি সরল মীমাংসা। আমাদের মাথায় খেলে নি।

আবুল আসফিয়া বললে, 'কুক কোম্পানির লোক টুরিস্ট সারের সুবেদার নিয়ে যাবে গাড়িতে ফাস্ট ক্লাসে করে—সুয়েজ থেকে কাইরো, এবং কাইরো

থেকে সইদ বন্দরে। কাইরোতে যে রাত্রি-বাস করতে হবে তার ব্যবস্থাও হবে অতিশয় খানদানী, অতীব্রব্র মাগলী হোটেল। আমরা যাব খার্ডে, এবং উঠব একটা সস্তা হোটেল। তা হলেই হল।'

প্রথমটায় আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সংবিত্ত ফেরা মাত্র আমার মনে আরেকটি কঠিন সমস্যার উদয় হল। যদি কোনো জায়গায় আমরা ট্রেন মিস করি কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনার মুখে পড়ে যাই আর শেবটার সইদ বন্দরে ঠিক সময়ে পৌঁছে জাহাজ না ধরতে পারি তবে যে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। বরঞ্চ চা খেতে গ্লাটফর্মে নেমেছি, আর গাড়ি মাল-পত্র নিয়ে চলে গেল সে সমস্যারও সমাধান আছে কিন্তু জাহাজ চলে গেলে কত দিন সইদ বন্দরে পড়ে থাকতে হবে, তার কি খরচা, নতুন জাহাজে নতুন টিকিটের জন্য কি গণ্ডা এসব তো কিছুই জানি নে। কুকের লোক এ সব বিপদ-আপদের জন্য জিম্মেদার, কিন্তু আবুল আসফিয়াকে জিম্মেদার করে তো আর আমাদের চারখানা হাত গজাবে না? তাঁকে তো আর বলতে পারবো না, 'মশাই, আপনার গাভ্রা পড়ে এত টাকার গণ্ডা হল—আপনি সেটা চালুন।'

শেষের কথাটা বাদ দিয়ে আমার সমস্যাটা নিবেদন করতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় মাত্র একটি বাক্য বললেন, 'নো রিক্স, নো গেন'—সোজা বাঙলায়, 'বেশেন দুই রমাকান্ত আর বিকারের বেলা গোবন্দন' সে হয় না। তুমি যদি দই খেতে চাও তবে বিকারটা হবে তোমারই। মাগুর মাছ ধরতে হলে গর্তে হাত দিতে হবে তোমাকেই। কিছুটা খুকি নিতে রাজি না হলে কোনো প্রকারের লাভও হয় না।

আবুল আসফিয়ার 'নো রিক্স, নো গেন' এই চারটি কথা—চাটখানি কথা নয়—শুনে পল দুচ্চিষ্টা-ভরা গলায় বললে, 'তাই তো!'

পার্সি মথা দাঁড়িয়ে বললে, 'সেই তো!'

আমি বললাম, 'ঐ তো!'

পল বললে, 'কিংবা মনে করুন কাইরোতে পথ হারিয়ে ফেললাম। আবুল আসফিয়া কি কাইরোর ভাষা জানেন? সেখানকার লোকে কি বুনি বলে তার নমাই তো জানি নে!'

পার্সি বললে, 'সেখো পল, তুমি কি জানো না তার ফিরিস্তি বানাবার এই কি প্রশস্ততম সময়? তাতে আবার সময়ও তো লাগবে কিন্তু।'

আমি পার্সিকে হাঁকা ধমক দিয়ে বললাম, 'আবার! পলকে বললাম 'আরবী। কিন্তু কিছু কিছু লোক নিশ্চয়ই ইংরিজি ফরাসী জানে রাস্তা ফের খুঁজে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

পল বললে, 'যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

আরো অনেক অসুবিধার কথা উঠল। তবে সোজা কথা এই দাঁড়ালো, একটা দেশের ভাবার এক বর্ণ না জেনে, এতখানি কম সময় হাতে নিয়ে সে দেশে

ঘোরাঘুরি করা কি সমীচীন? এতই যদি সোজা এবং সস্তা হবে তবে এতগুলো লোক কুকের ন্যাজ ধরে যাচ্ছে কেন? একা-একা কিংবা আপন-আপন দল পাকিয়ে গেলেই তো পারতো। তাই দেখা যাচ্ছে আবুল আসফিয়ার 'নো রিক্স, নো গেন' প্রবাদে—অস্বস্ত এক্ষেত্রে—'রিক্স' ন' 'সিক' গেন মেরে কেটে চৌদ পয়সা রবি ঠাকুর বলেছেন,

'আমার মতে জলংটাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—

মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।'

যদি আমাদের রিক্স সাতান্ন আর গেন তিন-চল্লিশ হত তা হলেও আমরা কানাইলালের মতো 'সোভ্রাসে ইয়ান্ডা' বলে খুলে পড়তুম—যাচ্ছি তো মুশলমান দেশে।

তখন স্থির হল, আবুল আসফিয়াকে পাকড়াও করে আরেক দফা সবিস্তর সওয়াল জবাব না করে কোনো কিছু পাকাপাকি মনস্থির করা যাবে না।

ধূয়া-ভূয়া করে করে, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর আমরা আবুল আসফিয়াকে পেলুম উপরের ডেকের এক কোণে, আপন মনে গুনগুনিয়ে গান গাইছেন। আমাদের দেখে, আমাদের কিছু বলার পূর্বেই বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, 'আমি কোনো কথাই শুনতে চাই নে। আমি কোনো উত্তর দিতে পারবো না। আমি কাইরো যাবো। তোমরা আসতে চাও ভালো, না আসতে চাও আরো ভালো।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো একটা শব্দ শুনতে পেলুম—শব্দটা ফার্সী, 'বুজ-দিল'—অর্থাৎ বকরির কলিজা, অর্থাৎ 'ভীতুরা সব।'

এই শাস্ত্র প্রকৃতি সদাশিব লোকটির কাছ থেকে আমরা এ আচরণ প্রত্যাশা করি নি। এ যেন সেনাপতির আদেশ, 'আমি তা হলে একাকী শত্রুসৈন্য আক্রমণ করব, তোমরা আসো আর নাই আসো।' ত্রিমূর্তি লগুড়াহত সারমেয়কৎ নিদ্রাশূন্য হয়ে স্ব-স্ব আসনে ফিরে এলুম। কারো মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে আহ্বারাদি করে যে যার কেবিনে শুয়ে পড়লাম।

'সিংহের ন্যাঞ্জে মোচড় দিতে নাই', কথাটি অতি ঋটি, কিন্তু আবুল আসফিয়া মিথ্র না মকট সেটা তো এখনও কিছু বোকা গেল না তাঁর আচরণ তেজীমান না লেজীমানের লক্ষণ তার তো কোন হদিস পাওয়া গেল না।

১১

পরদিন নিদ্রান্ত্রে কেবিন ছেড়ে উপরে আসতেই দেখি হৈ-হৈ রৈ-রৈ বাস্ত! এক দল লোক আবুল আসফিয়াকে ঘিরে নানা রকমের গল্প শুধোচ্ছে। কুক কোম্পানি কাইরো দেখবার জন্য চার একশ' টাকা আর আপনি বলেন, পঞ্চাশ টাকাতাই হয়, সেটা কি প্রকারে সম্ভব? আরেক দল বলে, তারাও আসতে রাজী কিন্তু যদিচ্যৎ কোনো প্রকারের গড়খড়় সড়বড় হয়ে যায় আর তারা জাহাজ না ধরতে পারে তখন যে ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হবে তার কি সমাধান?

অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমাদেরই মতো আমাদের গরীব সহযাত্রীরা জেনে গিয়েছে সস্তাতেও কাইরো এবং পিরামিড দেখা যায়। কাজেই এখন আর পল, পার্সি, আমি, এই ত্রিমূর্তি, এবং আবুল আসফিয়াকে নিলে চতুর্মুখ—এখন আর তা নয়, এখন সমস্যাটা সহসনয়না হয়ে গিয়েছে, জনগণমন সাড়া দিয়েছে।

আবুল আসফিয়া কেবল মাঝে মাঝে বলেন, 'হো জায়গা, সব কুছ হো জায়গা।'

হিন্দুস্থানী বলছেন কেন? তিনি তো ইংরাজী জানেন। তখন লক্ষ্য করলুম যে সব দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের ভিতর রয়েছে ফরাসী, জার্মান, স্পেনিশ, রুশ আরো কত কি? এরা সবাই বোঝে, এমন কোন ভাষা ইহ—সংসারে নেই। তাই তিনি নিশ্চিত মনে মাতৃভাষায় কথা বলে যাচ্ছেন। ইংরাজী বললে যা, হিন্দুস্থানী বললেও তা। ফল একই।

এমন সময় আমাদের দলের সব চেয়ে সুন্দরী মহিলা মধুর এবং দরদররা গলায় বললেন, 'মসিয়ো আবুল, যদি কোন কারণে আমরা জাহাজ মিস করি তখন যে আমরা মহা বিপদে পড়ব। আপনি তো আমাদের কাউকে তার অনিচ্ছায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন না যে আপনাকে জিম্মাদার হতে বলব?'

ক্রোধে শেনিয়ের যা বললেন, তার মোটামুটি অর্থ, 'আপনি যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তার জিম্মাদারি আপনার নয়, কিন্তু যদি কোনো রকমের বিপর্যয় উপস্থিত হয় তবে তার গুরুত্বটা আপনি ভালো করে বিবেচনা করে দেখলে হয় না কি?'

উপস্থিত সকলের মনোভাব মহিলাটি যেন অতি শ্লিষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। সবাই চিৎকার করে সায় দিলে আপন আপন ভাষায়।

ফরাসী দল—উই উই,

জার্মান দল—ইয়া ইয়া,

ইতালীয় দল—সি সি,

একটি রাশান—দা দা,

গুটি কয়েক ভারতীয়—ঠিক হৈ ঠিক হৈ,

পল পার্সি—ইয়েস ইয়েস,

আমি নিজ কিছু বলি নি—কিন্তু সে কথা থাক।

আবুল আসফিয়া উত্তরে ঘাড় নিচু করে বললেন, 'মৈ জিম্মেদার হ'।'

তাঁকে যদিও কেউ জিম্মেদার হবার শর্ত চায় নি তবু তিনি জিম্মেদার, এটা সম্পূর্ণ তারই দায়িত্ব।

১২

চাকরির সন্ধানে গিয়ে এক বাঙালী বড় সাহেব ইংরেজকে খুশী করার জন্য বলেছিল, 'হজুর, আপনার বাঙালোতে আসবার জন্য তয়ের চোটে পা আর ওঠে না। যদি এক পা এগোই তো তিন কদম পিছিয়ে যায়।' বড় সাহেব মাত্রই যে গাধা হয় তা নয়,—এ সাহেবের বুদ্ধি ছিল। বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই শুধাল, 'তা

হলে এখানে পৌছলে কি করে?' সায়েব যে বাবুর বিনয় বচন এতখানি শব্দার্থে নেবেন বেচারী সেটা অনুমান করতে পারে নি। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু চাকরির ফিকিরে বাঙালীর কাছে কোনো কসরত কোনো কৌশলই অজানা নেই। একটিমাত্র শুকনো টোক না গিলেই বললে, 'হজুর, তাই আমি আপন বাড়ীর দিকে মুখ করে চলতে আরম্ভ করলুম আর এই দেখুন দিব্য হজুরের বাঙালোতে পৌছে গিয়েছি।'

গমের বাকিটা আমার মনে নেই, তবে আবুল আসফিয়ার কাইরো ভ্রমণ প্রস্তাবে উমেদাররা যদি এক পা এগোন তবে তিন পা পিছিয়ে যান। পল, পার্সি আর আমি ছাড়া কেউই পাকাপাকি কথা দেন না, আমাদের পাটিতে আসছেন কিনা। অথচ ঘড়িঘড়ি তরো—বেতরো প্রশ্ন। গাড়ি যদি মিস করি, কাইরোতে হোটেলের যদি জায়গা না মেলে, যদি রাত্রিবেলা হয় আর আকাশে চাঁদ না থাকে তবে পিরামিড দেখব কি করে আরো কত কি বিদঘুটে সব প্রশ্ন। ওদিকে আবুল আসফিয়া আপন কেবিনে খিল দিয়ে শুয়ে আছেন। প্রশ্নের ঠেলা সামলাতে হচ্ছে আমাদেরই—আমরা যেন ইংলন্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের ভারতীয় ভাইসরয়! শেষটায় আমরাও গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করলুম।

সক্কোর বোঁকে জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পৌঁছল। সুয়েজ খালের মুখে এসে জাহাজ নেঙের ফেলতেই ডাক্তা থেকে একটা স্টীম-লঞ্চ এসে জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তখন জানা গেল আবুল আসফিয়ার দলে সবসুদ্ধ আমরা ন'জন যাবছি। তাঁকে নিয়ে দশ জন।

কুকের গাইড স্টীম-লঞ্চে করে ডাক্তা থেকে জাহাজে এসেছিল। দেখলুম, তার দলে বারো জন যাত্রী। তা হলে আমাদের দশ জন এমন মন্দ কি!

গাইড চড়চড় করে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে নামল—পিছনে পিছনে তার দলের বারো জন নামল পাশা-গোরুর ন্যাজ ধরে পাণী যে রকম ধারা বৈতরণী পেরোয়। আমাদের আবুল আসফিয়াও চকড় করে নামলেন যেন কত যুগের কানু গাইড।

কুকের গাইড এ রকম ব্যাপার আগে কখনো দেখে নি। তার তবিরি জিম্মেদারি উপেক্ষা করে এক পাল লোক চলেছে আপন গোষ্ঠে বেঁধে—এতখানি রিস্ক নিয়ে—এ ব্যাপার তার কাছে সম্পূর্ণ অবিস্বাস্য। আবুল আসফিয়ার দিকে যে ধরনে তাকালে তাতে সে দুর্বাসা হলে তিনি নিশ্চয়ই পুড়ে থাক হয়ে যেতেন—উনিই তো তার মক্কেল মেরেছেন।

তখন ভালো করে দেখলুম আবুল আসফিয়ার নবীন বেশভূষা। সেই কুলে-পড়া আঠারো-পকেট কোট, মাটি-ছোঁয়া চোঙা-পানা পাতলুন, তিনি বর্জন করে পরেছেন, একদম ফাস্ট ক্লাস নেভি ব্লু সুট-কোট, পাতলুন ওয়েস্ট কোট সামের—সোনালি বেনারসি সিল্কের টাই, তদুপরি ডাইমণ্ড টাই-পিন, পায়ে পেটেন্ট লেদারের মোলায়েম জুতো, তদুপরি ফর্ন রঙের স্প্যাট, মাথায় উচ্চতর ফেল্ট হ্যাট, গরম বলে বী হাতে ধরে রেখেছেন, নেবু রঙের কিড গ্লাভস, ডান হাতে চামড়ার একটি পোট ফোলিয়ো।

বিবেচনা করলুম, এই দুটে আঠারোটা পকেট নেই বলে তিনি পোট ফোলিয়েতে টফি চকলেট, সিগার সিগারেট ভর্তি করেছেন।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘন নীলাকাশ কেমন যেন সূর্যের লাল আর আপন নীলে মিলে বেগুনি রঙ ধরতে আরম্ভ করলে। তারই আভাতে লাল দরিয়ার আনিল ভলে ফিকে বেগুনি রঙ ধরে নিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর থেকে একশ' মাইল পেরিয়ে আসছে মশমধুর ঠান্ডা হাওয়া। সে হাওয়া লাল দরিয়ার এই শেষ প্রান্তে তুলেছে ছোট ছোট ভরষা। তারে-ই উপর দিয়ে দূলে দূলে আসছে আমাদের স্টীম-লঞ্চ। তার রঙ আসলে সাদা কিন্তু এই নীল লাল বেগুনির পাতায় পড়ে তারো রঙ যেন বেগুনি হতে আরম্ভ করলে।

স্টীমলঞ্চটি শুভ্রপুচ্ছ রাজহংসবৎ। রাজহাঁস সাঁতার ফেটে যাবার সময় যে রকম শুভ্র বীচিতরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, এ তরলীটিও তেমনি প্রপেলারের তাড়নায় জাগিয়ে তুলছে শুভ্র ফেননিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চক্রাবর্ত। বড় জাহাজের বিরাট প্রপেলার যখন এ রকম আবর্ত জাগায় তখন সেদিকে ডাকাতে ভয় করে, মনে হয় ঐ দায়ে পড়লে আর রক্ষে নেই কিন্তু ক্ষুদ্র লঞ্চের ছোট ছোট দায়ের একটি সরল মাধুর্য আছে। ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকা যায়।

সূর্য অস্ত গেল মিশর মরুভূমির পিছনে। পদ্মার সূর্যাস্ত, সমুদ্রের সূর্যাস্ত যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য ধরে ঠিক তেমনি মরুভূমির সূর্যাস্তও এক দর্শনীয় সৌন্দর্য। সোনালি বাগিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সেটা আকাশের বুকে হানা দেয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার রঙ বদলাতে থাকে। তার একটা রঙ ঠিক চেনা কোন জিনিসের রঙ সেটা বুঝতে না বুঝতে সে রঙ বদলে গিয়ে অন্য জিনিসের রঙ ধরে ফেলে। আমাদের কথা বাস দাও, পাকা আটপাড়া পর্যন্ত এই রঙের খেলা দেখে আপন রঙের পেলেটের দিকে তাকাতে চান না।

সুয়েজ বন্দরে ইংরেজ সৈন্যদের একটি ঘাঁটি আছে। তাই রবি ঠাকুরের ভাষায় "বড় সায়েবের বিবিগুলো নাইতে নেমেছে।" কেউ কেউ আবার ছোট ছোট নৌকো করে এখানে ওখানে ঘোরাফুরি করছে। নৌকোগুলি হালফ্যাশনের ক্যাফিসে তৈরী। নৌকোর পাঁজর ভেনেস্তা কাঠের দড় শলা দিয়ে বানিয়ে তার উপর ক্যাফিস মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় নৌকো কলারপিসবল-পোর্টেবল অর্থাৎ নৌ-ভ্রমণের পর ভেনেস্তার পাঁজর আর ক্যাফিসের চামড়া আলাদা আলাদা করে নিয়ে, ব্যাগের ভিতর প্যাক করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। ওজন দশ সেরের চেয়েও কম। পরিপাটি ব্যবস্থা! অবশ্য নৌকোগুলো খুব ছোট। দুজন মুখোমুখি হয়ে কার্যক্রেম বসতে পারে। মাঝখানে সামান্য একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে জল বাঁচিয়ে টুকটাকি জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। একজোড়া গুলী দেখি সেখানে একটা পোর্টেবলের উপর ব্রেকড লাগিয়েছে দু জন্যাবের।

ঐ তো মানুষের স্বভাব, কিংবা বলব বজ্জাতি। যেখানে আছে সেখানে থাকতে চায় না। যে জোড়া দু জন্যাব বাজাচ্ছে তাদের যদি একটা জন্যাবা নদীর উপর ভাসিয়ে দাও তবে তারা গাইতে শুরু করবে, "মাই হার্ট ইজ ইন দি হাইশ্যাড, মাই হার্ট ইজ নট হিয়ার।"

তাকে যদি তখন ভূমি ঝটল্যাভের হাইশ্যাডে নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে, "ইম রোজেন-গার্টেন ফন সীসুসী" অর্থাৎ "সীসুসীর গোলাপ-বাগানে"—সীসুসী পংসদামে, বাগিনের কাছে। তখন যদি তুমি তাকে বাগিন নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে তারতবর্ষের গান। জার্মানির বড় কবি কি গেয়েছেন শোনো,

পদ্মার পার-মধুর গঙ্গা ত্রিভুবন আলো তরা—  
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে  
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা  
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

আমু গান্ধেস্ ডুফটেটস্ লয়েষ্টটস্  
উন্ট সীসেনবয়মে ব্যুয়েন,  
উন্ট শোনে স্টিলে মেনেশন  
ফর লটসব্রুয়েন ক্রিয়েন।

এবং সেখানে যখন মন ওঠে না তখন গোয়ে উঠেন স্বপ্নপূরীর গান, যে পুরী কেউ কখনো দেখেনি, যার সঙ্গে আমাদের মতো সাধারণ জনের কোনোই পরিচয় নেই, কবিরাই শুধু যাকে মর্ত্যলোকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন—

কোথা হয় সেই আনন্দ নিকেতন?  
স্বপ্নেই শুধু দেখি সে ভুবন আমি,  
রবিকর এল, ভেটে গেছে হায়, যামী  
ফেনার মতন মিলে গেল এ স্বপন।

আখ ইয়েনস্ লান্ট ডের তানে,  
ডাস্ জে ইয় অফট ইম টাউম;  
ডখ কমট জী মর্গেনজনে,  
ফেরলীস্ট্ জী আইটেলশাউম।

আমি কিছু যেখানে থাকি সেখানেই থাকতে ভালোবাসি। নিত্যন্ত বিপদে না পড়লে আমি আপন গী ছেড়ে বেরতে রাজী হইনে। দেশভ্রমণ আমার দু চোখের দুশমন। তাই যখন রবিঠাকুর আপন ভূমির গান গোয়ে উঠেন তখন আমি উদ্ধা হইয়ে নৃত্য আরম্ভ করি। শোনো—

তোমরা বল, স্বর্গ ভালো  
সেখায় আলো  
রঙে রঙে আকাশ রঙায়  
সারা বেলা  
ফুলের খেলা  
পারল ডাডায়।

হক না ভালো ফত ইচ্ছে-  
 কেড়ে নিচ্ছে  
 কেউ বা তাকে বলো, কাকী?  
 যেমন আছি  
 তোমার কাছেই  
 তেমনি থাকি।  
 ঐ আমাদের গোলাবাড়ি  
 গোরুর গাড়ি  
 গড়ে আছে চাকা ডাঙা,  
 গাবের ডালে  
 পাতার লালে  
 আকাশ রঙা।  
 সন্ধ্যাবেলার গল্প বলে  
 রাখো কোলে  
 মিটিমিটিয়ে জ্বলে বাতি।  
 চালতা-শাখে  
 পেঁচা ডাকে  
 বাড়ে রাতি।  
 স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি  
 বলছি, কাকী,  
 দেবব আমায় কে কি করে।  
 চিরকালই  
 রইব খালি  
 তোমার ঘরে।

এ ছেলে তার কাকীমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে যা বলেছে সে-ই আমার  
 প্রাণের গান, তাতে আমার সব দেহ-মন সাড়া দেয়। বিস্তর দেশ ভ্রমণের পর  
 আমি তাই এই ধরনের একটি কবিতা দিখেছিলুম। কত না খুলোখুলি, তারো  
 বেশী ধুলে দেবার পরও যখন কোনো সম্পাদক সেটা ছাপাতে রাজি হন নি—  
 'বসুমতী'র সম্পাদকও তাঁদেরই একজন—তখন তোমাদের ঘাড়ে আজ আর সেটা  
 চাপাই কোন অধম বুদ্ধিতে?

দুখ করে থাকে লাগতে সংবিত্তে ফিরে এলুম। লজ্জা পাড়ে লেগেছে। কিন্তু  
 এরকম থাকে লাগবে কেন? আমাদের গোয়ালন্দ ঈদপুরে তো এ রকম বেয়াদবী  
 থাকে দিয়ে জাহাজ পাড়ে ভিড়ে না।

আবার।

'সেই পূর্ণিমা সন্ধ্যায়,  
 দেশ পানে মন যায়।'

সুয়েজ বন্দর কিছু ফেলনা বন্দর নয় বন্দরটার 'সামরিক' গুরুত্ব-  
 ষ্ট্রাটাজিক ইম্পোর্টেন্স—আছে বলে ইংরাজকে তার নৌবহরের একটা অংশ  
 এখানে রাখতে হয়। যে সব গোরাদের কার্যসেব নৌকোয় করে জলকেলি করতে  
 দেখেছিলুম তারাই এই সব নৌবহরের তদারকি করে। ফলে তাদের জন্য এখানে  
 দিয়া একটা কলোনি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু কিছুই নয়, কিছুই নয়, পূর্বের তুলনায় আজ সুয়েজ বন্দরের কি আর  
 জয়ক জৌলুস। কেপ অব গুড হোপের পথ না বেরনো পর্যন্ত, এমন কি তার পরও  
 ভারতবর্ষ, বার্মা, মালয়, যবদ্বীপ, চীন থেকে যে-সব জিনিস রপ্তানি হত তার  
 অধিকাংশই সমুদ্রপথে এসে নামত সুয়েজ বন্দরে—এবং জুলে চলবে না,  
 তখনকার দিনে প্রাচ্যই রপ্তানি করত বেশী। এখান থেকেই ফিনিশিয়ানরা, তার  
 পরে গ্রীক, তারপর রোমান, তারপর আরবরা ভারতের দিকে রওনা হত। ভারত  
 থেকে মাল এনে সুয়েজে নামনো হত। সুয়েজ থেকে একটা খালে করে এ সব মাল  
 যেতো কাইরোতে এবং সেখান থেকে নীল নদ বয়ে সেমাল পৌছত  
 আলেকজেন্ড্রিয়ায়—আরবীতে যাকে বলে ইস্কন্দরিয়া। সেখান থেকে ভেনিসের  
 মাধ্যমে তাবৎ ইউরোপ।

এই সব মাল কেনাকাটা আমদানি-রপ্তানিতে ভারতবর্ষের প্রচুর সদাগর-  
 শ্রেষ্ঠী, মাঝি-মাস্তার বিরাট অংশ ছিল। সে যুগে ডাকো-দা গামা এ পথকে  
 নাকচ করে দেবার জন্য আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসার পথ বের করলেন সে যুগে  
 পূর্বে প্রাচ্যের তাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ভারতীয় এবং সুয়েজ অঞ্চলের  
 মিশরীয়দের হাতে।

এক দিকে ভারতীয় এবং মিশরীয়, অন্য দিকে ডাকো-দা-গামা বংশধর  
 পর্তুগীজ দল।

জাত তুলে কথা কইতে নেই, তাই ইশারা-ইঙ্গিতে কই। এই যে পর্তুগীজ  
 গুণ্ডারা গোয়া নিয়ে আজ দাবডাদাবড়ি করছে এ-কিছু নতুন নয়। ওদরে স্বভাব  
 ঐ। এক কালে তারা জলে বোম্বটে ছিল, এখন তারা ডাক্ষার গুণ্ডা। 'বোম্বটে'  
 শব্দের মূল আর অর্থ অনুসন্ধান করলেই কথাটা সপ্রমাণ হবে। 'বোম্বটে' কিছু  
 বড়ালীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বানানো আজগুবি কথা নয়। 'বোম্বটে' শব্দ  
 এসেছে ঐ পর্তুগীজদের ভাষা থেকেই—(bombardeiro), অর্থাৎ যারা না-বলে  
 না-কয়ে যত-তত (bomba)-বোমা ফেলে। হয়তো বলবে, আমাদের  
 কলকাতাতেই কেউ কেউ এরকম বোমা ফেলে থাকে,—কিন্তু তাদের সংখ্যা  
 এতই নগণ্য এবং ঘৃণ্য যে আজ তাবৎ কলকাতাবাসীকে কেউ বোম্বটে নাম দেয়  
 নি। কিন্তু তাবৎ পর্তুগীজরাই এই অপকর্ম করাতো বলে তাদের নাম হয়ে গেল  
 'বোম্বটে'।

banglainternet.com



ওদের দ্বিতীয় নাম—আমাদের বাংলা ভাষাতেই—‘হারমদ’ সেটাও পর্তুগীজ কথা armada থেকে এসেছে। বিখ্যাত কোবকার বগীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর সুবিখ্যাত অভিধানে এ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘পর্তুগীজ জলদস্যুরা যখন বাংলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম হানা দেয় তখন তাদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালীরা সুন্দরবন অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমাদের ঘরোয়া কবি কবিকঙ্কণ মুকন্দরামের চণ্ডীকাব্যে আছে,—

‘ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।

রাত্রিতে বহিয়া যায় হারমদের ডরে।।’

অর্থাৎ এই সব ‘হারমদ’-armada’ বোঝেটে ‘hombareiro-’ দের ডরে তখন দক্ষিণ-বাঙলার লোক নিচিন্ত মনে ঘুমতে পারত না।

এস্থলে যদিও অবাস্তব, তবু প্রশ্ন, বাঙালীরা এত ভয় পেয়ে পালল কেন?

উত্তরে বলি, যে কোনো বন্দরে, জাহাজ থেকে নেমে, এক পাল লোক সেটাকে শূট-তরাজ করতে পারে। এটা আদর্শেই কোনো কঠিন কর্ম নয়, ‘যদি,-’ এইখানেই এক বিরাট ‘যদি’—

যদি সে রাজা তার সমুদ-কূল রক্ষার জন্য নৌবহর মোতায়েন না করেন। জনপদ রক্ষা করার জন্য যে রকম পুলিশ-সেপাই রাজাকেই রাখতে হয়, ঠিক তেমনি সমুদ-কূলবাসীদের হোন্সজতির জন্য রাজাকেই নৌবহর রাখতে হয়।

কিন্তু হয়, তখন বাংলাদেশ হুমায়ুন, আকবর মোগল বাদশাদের হুকুমে চলে। মোগলরা এদেশে এসেছে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে। তারা শক্ত মাটির উপরে খাড়া পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তিযুথ, উষ্ট্রবাহিনী চতুরঙ্গ সৈন্য-সামন্তের কি প্রয়োজন সে তবু বিলক্ষণ বোঝে, কিন্তু নৌবহর রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। বাঙলা, উড়িষ্যা, গুজরাত থেকে তাদের কাছে অনেক করুণ আবেদন নিবেদন গেল—‘হজুরেরা দয়া করে একটা নৌবহরের ব্যবস্থা করুন; না হলে আমরা ধনে-প্রাণে মানে-ইজ্জতে গেলুম।’

কথাগুলো একদম শব্দার্থে ঝাঁট। ‘ধন’ গেল, কারণ পর্তুগীজ বোম্বার্ডেদের অত্যাচারে ব্যবসা-বাণিজ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ। ‘প্রাণ’ যায়, কারণ তারা বন্দরে বন্দরে শূট-তরাজের সময় যে-সব খুন-খারাবি করে তারই ফলে বন্দরগুলো উজার হতে চলল। মান-ইজ্জত? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পর্তুগালের হাটবাজারে গোলাম বাদী, দাসদাসীরাপে বিক্রয় করছে।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! মোগল বাদশারা বসে আছেন পশ্চিম পানে, খাইবার-পাসের দিকে তাকিয়ে। ঐ দিক থেকেই তাঁরা এসেছেন বয়ং, তাঁদের পূর্বে এসেছে পাঠান শকুন্-সিথিয়ান-এরিয়ান। তাই তাঁরা তৈরী করেছেন চতুরঙ্গ। ওদের ঠেকাবার জন্য। নৌবহর চুলোয় যাক গে। ভারতবর্ষ তো কখনো সমুদপথে পরাজিত এবং অধিকৃত হয়নি। তার জন্য বৃথা দুর্ভিত্তা এবং অযথা অর্থক্ষয় অতিশয় অপ্রয়োজনীয়।

ফলে কি হল? পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ সমুদপথেই মোগলদের মুণ্ড কেটে এদেশে রাজ্য বিস্তার করলো।

সেকথা পরের কথা। উপস্থিত আমরা আলোচনা করছি, ভারতীয় উপকূল বাসীরা পর্তুগীজদের সঙ্গে যে লড়াই দিয়েছিল তাই নিয়ে। এরা তো মোগলদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পেল না, উল্টে যারা লড়াইছিল, তাদের সঙ্গে আরম্ভ করলেন শত্রুতা।

গুজরাতের রাজা বাহাদুর শাহ বাদশাহ তখন লড়াইলেন পর্তুগীজ বোম্বার্ডেদের সঙ্গে। তার প্রধান কারণ, গুজরাতের সুরট, রউচ (ডুগ, খবাত Cambay, স্তম্ভপুরী) ভিতর দিয়ে উত্তর-ভারতের যাবতীয় পণ্যবস্তু ইয়োরোপে যেত। সে-ব্যবসা তখন পর্তুগীজ বোম্বার্ডেদের অত্যাচারে মর-মর। বাহাদুর শাহ বাদশাহ তখন দুই শত্রু। একদিকে সমুদপথে পর্তুগীজ, অন্যদিকে স্থলপথে রাজপুত। প্রথম রাজপুতদের হারিয়ে দিয়ে পরে পর্তুগীজদের খতম করার প্রাণ করে তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে করলেন—আর্মিস্টিস—সময়কালীন সন্ধি। তারপর হানা দিলেন রাজপুতনায়।

দিল্লীতে তখন রাজত্ব করেন বাদশা হুমায়ুন। ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছে, তখন এক রাজপুতানী শাহ-ইন-শাহ দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরকে পাঠালেন রাখী। সেই রাখীর সম্মানার্থে হুমায়ুন ছুটলেন রাজপুতানার দিকে। বুঝলেন না, বাহাদুর শাহ হেরে গেলে পর্তুগীজদের আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। পূর্বেই বলেছি, নৌবহর নৌসাম্রাজ্য বলতে কি বোঝায়, মোগলরা সে কথা আদর্শেই বুঝতো না।

হুমায়ুন রাজপুতনায় পৌছলেন দেরিতে। বাহাদুর শাহ বাদশাহ তখন রাজপুতনা জয় করে ফেলেছেন রাজপুতানীরা জৌহররতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হুমায়ুন তখন আক্রমণ করলেন বাহাদুর শাহকে। বাহাদুর তখন পাশিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন চম্পানির দুর্গে। সেখানে কি করে হুমায়ুন দুর্গ জয় করলেন, সে কাহিনী অবশ্য ইতিহাসে পড়েছে। ইতিমধ্যে বাহাদুর দুর্গ ত্যাগ করে পাশিয়েছেন গুজরাতে আপন রাজধানী আহমদাবাদের দিকে। হুমায়ুন সেদিকে তাড়া লাগাতে তিনি পালালেন সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ কাঠিওয়াড়ার দিকে। সেখানকার কোনো কোনো উপকূলে তখন পর্তুগীজরা বেশ পা জমিয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন খবর পেলেন, বিহারের রাজা শেরশাহ দিল্লী জয় করার উদ্দেশ্যে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তদন্তেই তিনি বাহা-দুরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চললেন দিল্লীর দিকে। সেখানে শেরশাহের কাছে মার খেয়ে তিনি পালালেন কাবুলে তারপর শের শাহ বাস্ত হয়ে রইলেন, উত্তর-ভারতে আপন প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে। বাহাদুরকে তাড়া দেবার ফুরসত তাঁর নেই। বাহাদুর হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বললেন, “এইবারে তবে পর্তুগীজ বদমায়েশদের ঠাণ্ডা করি।” পর্তুগীজরা ততদিনে বুঝতে পেরেছে, বাহাদুরের পিছনে তখন আর শত্রু নেই তাই তারা আরম্ভ করলে তাদের পুরনো বদমায়েশি। বাহাদুর শাহকে আমন্ত্রণ জানালে, তাদের জাহাজে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য সন্ধি-চুক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা পরামর্শ করার জন্য।

বাহাদুর আহম্মুখের মত কেন গেলেন সেই নিয়ে কিন্তু ঐতিহাসিক গণ বহু আলোচনা গবেষণা করেছেন। সে নিয়ে আজ আর আলোচনা করে কেনো লাভ নেই।

তা সে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্য। বাহাদুর জাহাজে ওঠা মাত্রই বুঝতে পারলেন, তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। পর্তুগীজের বদ-মতলব তাকে বুন করার, তাঁর সঙ্গে সন্ধি-সুলহ করার জন্য নয়। তক্ষুণি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে সাঁতরে পাড়ে ওঠার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে দশ মিশটা পর্তুগীজও হাতে বৈঠা নিয়ে তাঁর পিছনে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সব বৈঠা দিয়ে গুজরাতের শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ বাহাদুর শাহের মাথা ফাটিয়ে দিলে।

পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ভারত বর্ষের এই শেষ লড়াই।

কিন্তু আজ সুয়েজ বন্দরে ঢোকার সময় আমি দেশ পানে ফিরে গিয়ে এসব কথা পাড়ছি কেন?

কারণ এই সুয়েজের রাজাকেই বাহাদুর তখন ডেকেছিলেন তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে এসে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁকে নৌ-সমরে সাহায্য করতে। পূর্বে বলেছি, সুয়েজও বেশ জানতো পর্তুগীজদের বোম্বার্ডেগিরি জাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কতখানি মারাত্মক। শুধু বাহাদুর নয় তাঁর পূর্বপুরুষগণও বার বার এঁদের ডেকেছেন দুয়ে মিলে পর্তুগীজদের একাধিকবার খিষ্টে-পোস্ত চন্দন বাটা করেছেন।

তারা তখন যেসব কামান এনেছিল সেগুলো কেঁরত নিয়ে যায় নি। গুজরাতের বাদশা যখন বললেন, 'এগুলো রেখে যাচ্ছেন কেন?' তখন তারা বলেছিল, 'এই সব পর্তুগীজ বদমায়েশরা আবার কখন হানা দেবে তার ঠিক ঠিকানা কি? আবার তখন কামান নিয়ে আসার হাঙ্গাম হচ্ছে। ঠেলবার কি প্রয়োজন?'

এ ঘটনার দশ বৎসর পর আকবর গুজরাত জয় করেন। তিনি কামানগুলো দেখে তাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস জেনেও নৌ-বাহিনী নৌ-সমরের মূল্য বুঝতে পারেন নি। তাই পর্তুগীজরা জিতল। তাদের হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ জিতল। ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজ কলকাতা হয়ে তাবৎ ভারতবর্ষে আপন রাজ্য বিস্তার করলো।

আজ সুয়েজে ঢুকে সেই কথাই স্মরণে এল, এই সুয়েজের লোকই একদিন আমাদের সঙ্গে একজোট হয়ে পর্তুগীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে কী লড়াই-ই না দিয়েছিল।

১৪

সবিত্তে ফিরে এলাম। দেখি বখেড়া লেগে নিয়েছে। কন্ডরে বেমে যে দস্তারের ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেখানে আমাদের অর্ধাং আবুল আসফিয়ার দলকে আটকে দিয়েছেন বন্দরের কর্তারা। কেন কি ব্যাপার? আমাদের হেলথ সার্টিফিকেট কই?

সে আবার কি ছালা? দিবা ভো বাবা লক্ষ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এখানে এলাম, ষ্টেচারে চেপে কিংবা মড়ার খাটিয়া শুয়ে আসিনি তবে আমাদের হেলথ সবকিছু এত সন্দ কেন? উই, কর্তারা বলছেন আমরা যে ভিতরে ভিতরে বসন্ত, প্রেগ, কলেরা, থুসেংসে সে জ্বর (সে আবার কি মশাই?) স্পটেড ফীভার (ততোধিক সমস্যা, আলপনা কাটা জ্বর?) ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক রোগে ভুগছি না তার সার্টিফিকেট কই। আমরা যে এসব পাণিষ্ট রোগ তাঁদের সোনার দেশ মিশরে ছড়াব না, তার কি জিহাদারি?

শুনে পার্সি বলছে 'স্মারৎ এসব মারাত্মক রোগেই যদি ভুগব, তবে বাপ-মার সেবাশুশ্রূষা ছেড়ে পার্টিসাহবের শেষ ধর্মবচন না শুনে এখানে আসব কেন?'

দ্যাশের লোক প্রতুল সেন বলছে, 'মিশরের সঙ্গে এরকম ধারা দুশমনি আমরা করতে যাবো কেন?'

তার বউ রমা বলছে 'পিরামিড তোমাদের গৌরবের বস্তু, আমাদের যে রকম তাজমহল। তার কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে বিচারের সুযোগ না দিয়ে আপনারা আপন দেশের প্রতি কি অবিচার করছেন বুঝতে পারছেন কি?'

আমি কানে কানে রমাকে শুখালুম, 'তবে কুকের সঙ্গে যে সব লোক এসেছিল তারা পেরুল কি করে?'

রমা বললে, 'চুপ করুন, ওরা যে ওই সব হলদে হলদে কাগজে দেখালে। আমাদেরও আছে। জাহাজে ফেলে এসেছি। আমরা তো জানতুম না এখানে ওসব রাবিশের দরকার হবে। কুকের লোক জানত, ওরা তাই সার্টিফিকেট এনেছিল।'

ওঃ! তখন মনে পড়ল প্যাসপোর্ট নেবার সময় ভ্যাকসিনেশন ইনকুলেশন করিয়েছিলুম বটে এবং ফলে একখানা হলদে রঙের সার্টিফিকেটও পেয়েছিলুম বটে। সেইটে নেই বলেই এখানে এ গদিশ।

কিন্তু এ শিরঃপীড়া তো আমাদের নয়। আবুল আসফিয়া যখন আমাদের দলের নেতা তখন তাঁরই তো বোকা উচিত ছিল যে ঐ ম্যাটমেটে হলদে রঙের কাগজটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই সামান্য কান্ডজ্ঞান যার নেই—

চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। দেখি, পল আমার হাত টানছে আর কানে কানে বলছে, 'চলুন জাহাজে ফিরে যাই।'

কিন্তু আবুল আসফিয়া কোথায়?

তিনি দেখি নিশ্চিন্ত মনে, একে সিগারেট দিচ্ছেন, ওকে টফি খাওয়াচ্ছেন তাকে চকলেট গেলাচ্ছেন। কোলে আবার একটা বাচ্চা। খোদায় মালাম কার?

লোকটা তাহলে বদ্ধ পাগল। পাগলের সম্পর্ক ত্যাগ করাই ধর্মাদেশ।

পলার হাত ধরে পোর্ট-আপিস ছেড়ে সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছলুম। তখন দেখি আমাদের জাহাজ ভৌ ভৌ করে গুরুগম্ভীর নিনাদে সুয়েজ খালে ঢুকে গিয়েছে।

দেশে ভ্রমণ আমি বিস্তর করেছি। সামান্য কিছু ঘটতে না ঘটতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়ি নে। রিফ্রেশমেন্ট রুমে চা খেতে গিয়েছি, ওদিকে গাড়ি আমার বাস্ক— তোরঙ্গ বিছানা—বালিশ নিয়ে চলে গিয়েছে বিদেশে বিভূঁইয়ে মনি-ব্যাগ চুরি যাওয়াতে আমি কপর্দকহীন, ইতালীর এক রেস্তোরাঁয় দুই নলে ছোরা-ছুরি হচ্ছে—আমি নিরীহ বঙালী এক কোণে দেয়ালের চুনকামের মতো হয়ে গিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছি—এ সব ঘটনা আমার জীবনে একাধিকবার ঘটেছে। কিন্তু এবার সুয়েজ বন্দরে, আবুল আসফিয়ার পাল্লায় পড়ে যে বিপদে পড়লুম তার সঙ্গে অন্য কোনো গর্দিশের তুলনা হয় না।

আমাদের জাহাজ তার সাগর পথে চলে গিয়েছে। আমরা এখানে আটকা পড়েছি হেলথ সার্টিফিকেট নেই বলে। তা হলে এখানকার কোনো হোটেলে উঠতে হয় এবং প্রতি জাহাজে ধনা দিতে হয়, আমাদের জায়গা দিবে কি না। খুব সম্ভব দেবে না। কারণ সেই পোড়ারমুখো হেলথ সার্টিফিকেট না থাকলে জাহাজে উঠতে দেয় না। এখানে 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ' নয় এখানে 'জলে সাপ ডাঙায়ও সাপ।'

জাপানী আক্রমণের সময়ে একটা গাইয়া গান শুনেছিলুম,

সা রে গা মা পা ধা নি

বোমা পড়ে জাপানী

বোমা-ডরা কালো সাপ

বিটিশে কয় 'বাপ রে বাপ!'

তাই মনে হল জাপানীরা যেন জলে ডাঙায়, উভয়তঃ হেলথ সার্টিফিকেটর সাপ ফেলে গেছে।

আর ডাঙার হোটেলে থাকতে দেবেই বা কদিন? আমাদের ট্যাকে যা কড়ি তার খবর হোটেলওয়ালার ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পেরে নিশ্চয়ই আমাদের 'দুন্দুর' করে তাড়িয়ে দেবে। তখন যাবো কোথায়, যাবো কি? তখন অবস্থা হবে সুয়েজ বন্দরের ধনী-গরীব সত্ত্বলের কাছে ভিখ মাঙবার, কিন্তু কেউ কিছু দেবে কি? রেল-ইন্সটিশানে যখন কেউ এসে বলে, 'মশাই মনি-ব্যাগ চুরি গিয়েছে; চার গণ্ডা পয়সা দিন, বাড়ির ইন্সটিশানে যেতে পারব'; তখন কি কেউ শোনা মাত্রই পয়সা চালে?

ইয়া আত্মা এ কোথায় ফেললে বাবা? এ যেন অকূল সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপবাস।

মানুষ যখন ভেবে কোনো কিছুর কূল-কিনারা করতে পারেনা তখন অন্যের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করে। পল পার্সিকে নিয়ে ফিরে গেলুম আবুল আসফিয়ার কাছে।

তিনি দেখি ঠিক সেই মুহূর্তেই পোর্ট অফিসারকে শুধাচ্ছেন 'তা হলে হেলথ সার্টিফিকেট কোথায় পাওয়া যায়?'

এ যেন পাগলের প্রশ্ন! হেলথ সার্টিফিকেট তো পাওয়া যায় আপন দেশে; এখানে পাবো কি করে?

তাই আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না যখন অফিসার বললেন, 'কেন ঐ তো পাশের দফতরে।'

তা হলে এতক্ষণ ধরে এ-সব টানা হাঁচড়ার কি ছিল প্রয়োজন? ভালো করে শোনার পূর্বেই আমরা সব কাটা প্রাণী ছুট দিলুম সেই দফতরের দিকে। জলের সাপ ডাঙার সাপ, সা- রে-গা-মার জাপানী সাপ সব কটা তখন এক জোটে যেন আমাদের তাড়া লাগিয়েছে।

দফতরের দরওয়াজা খোলাই ছিল। দেখি এক বিরাট বণু ভদ্রলোক ছোট একখানা চেয়ারে তাঁর বিশার কলেবর গুঁজে পুরে টেবিলের উপর পা দু খানি তুলে ঘুমুচ্ছেন। আমরা অটরোল করে না ঢুকলে নিশ্চয়ই তাঁর নাকের ফরফরানি শুনতে পেতুম। আমাদের 'হেলথ সার্টিফিকেট' 'হেলথ সার্টিফিকেট', 'প্লীজ, প্লীজ' এ উৎকট সমবেত সঙ্গীতে-অবশ্য ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, যার এক সত্ত্বকে বাজে তোড়ী অন্য সত্ত্বকে পূরবী ভদ্রলোক চেয়ার সূত্র লাফ মেরে উঠলেন।

শতকরা নিরানন্দুই জন যাত্রী হেলথ সার্টিফিকেট নিয়ে বন্দরে নামে। সুতরাং এ ভদ্রলোকের শতকরা নিবারণন্বই ঘটাই কাটে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। তাই আমরা কি বেদনা কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসেছি সেটা বুঝতে তাঁর বেশ একটু সময় লাগল।

তাঁর ভাষা আমরা বুঝিনে তিনি আমাদের ভাষা বোঝেন না। তৎসম্মুখে যে মারাত্মক দুঃসংবাদ তিনি দিলেন তার সরল প্রাক্কল অর্থ, যে ডাক্তার আমাদের পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেবেন তিনি বাড়ি চলে গেছেন।

গোটা সাতক ভাষায় তখন যে আতঁরব উঠলো তাকে বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

ঐ য-যা!

ফরাসীরা বলেছিল 'মঁ দিয়ে, 'মঁ দিয়ে!'

জার্মানরা বলেছিল, 'হের গট হের গট!'

ইরানীরা বলেছিল 'ইয়াস্তা, ইয়া খুদা!'

আর কে কি বলেছিল, মনে নেই।

কিন্তু সৃষ্টি কর্তার অসীম করুণা, আত্মত্যাগালার বেহদ মেহেরবানি, রাখে কেউ মারে কে, ধনাবাদ ধনাবাদ শুনি অফিসার বলছেন 'কিন্তু আপনারা যখন বহাল তব্বিতে, দিব্য ঘোরাফেরা করছেন। তখন আপনারা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবান! সার্টিফিকেট আমি দেব। এই নিন ফর্ম। ফিল্ অপ করুন।' বলেই এক তাড়া বিদ্রী নোত্রা বাদামী ফরম আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনে হল, আহা কি সুন্দর! যেন ইকুলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট, আর সব ক-টাতে লেখা আছে আমি ক্লাসে ফাস্ট হয়েছি।



শকুনির পাল যে রকম মড়ার উপর পড়ে, আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লুম সেই 'গাজী মিয়া'র বস্তানির উপর। উহু, ভুল উপমা হল, বীভৎস রসের উপমা দিতে আলঙ্কারিকরা বারণ করেছেন। তাহলে বলি, ফাঁসির হুকুম নাকচ করে দেবার অধিকার পেলে মা যে রকম নাকচের ফর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উৎসাহে, উত্তেজনায় আমাদের সবাইকার মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। ফর্ম প্রশ্ন, 'কোন সালে তোমার জন্ম?' কিছুতেই মনে পড়ছে না ১৮০৪-না ১৭০৪? প্রশ্ন, 'কোন বন্দরে জাহাজ ধরেছে? বেবাক ভুলে গিয়েছি হংকং না তিব্বত। প্রশ্ন, 'যাবে কোথায়? হায় হায়, টাকের বাকি আড়াই গাছা চুল ছিড়ে ফেললুম, তবু কিছুতেই মনে পড়ছে না, শনি গ্রহে না ক্রবতরায়!

তা সে যাক গে, আমরা কি লিখেছিলুম তাই নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। পরে জানলুম, সেই সহৃদয় অফিসারটি ইংরেজি পড়তে পারেন না।

অপাখ্যপ বেগনি স্ট্যাম্প মেরে তিনি আমাদের গণ্ডা আড়াই সার্টিফিকেট ঝেড়ে দিলেন। আমরা সেগুলো বসরাই গোলাপের মতো বুকে গুঁজে খেলা-ধোঁয়াড়ের গোরুর মতো বন্দরের অফিস থেকে সুসুড় করে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এণুম। এখন আমরা ইচ্ছে করলে কেপ কমরিন যেতে পারি, ইচ্ছে না করলে কোথাও যাবো না।

পল বললে 'স্যার, কি লিখতে কি লিখেছি কিছুটা জানি নে।'

আমি বললুম, 'কিছু পরোয়া করো না ভাই! অথো তদবৎ।'

ফরাসী রমনী হেসে বললেন, 'মসিয়ে পল, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করত তুমি বকরী না মানুষ? তা হলে আমি প্রথম খানিকটে ব্যা ব্যা করে নিতুম তারপর আপন মনে খানিকটে ফরাসী বলে নিয়ে দেখতুম কোনটা ভালো শোনানো এবং সেই হিসেবে লিখে দিতুম বকরী না মানুষ।'

তারপর খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য বকরীর সম্ভাবনাই ছিল বেশী।'

আমার বুকে বড় বাকল। নিজের প্রতি এ যে অতিশয় অহেতুক অশঙ্কা। বললুম 'মাদমোয়াজেল বরফ 'কোকিল' লিখলে আমি আপত্তি জানাতুম না। আপনার মধুর কণ্ঠ—

'বাস, বাস হয়েছে, হয়েছে থ্যাঙ্কস্।'

ততক্ষণে রেল-স্টেশনের কাছে এসে পৌঁছেছি। দূর থেকে দেখি টেন দাঁড়িয়ে। আমরা পা চালানুম। কিন্তু গेटের কাছে আসতে না আসতেই টেনখানা 'ধ্যাৎ ধ্যাৎ' করে যেন আমাদের ঠাটা করে প্র্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং একটা লোক-চেনা-চেনা মনে হল—আমাদের দিকে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিদায় জানালে, তারপর যেন কত না বিরহ বেদনাতুর সেই ভাবে দুহাতের উল্টো দিক দিয়ে অদৃশ্য অশ্রু মুছলে।

এ মঞ্চারার অর্থ কি?

শুনলুম, আজ সন্ধ্যায় কাইরো যাবার শেষ টেন এই চলে গেল। কাল সকালে টেন ধরলে কাইরো মাথায় থাকুন সঈদ বন্দরে পৌঁছতে পারব না, অর্থাৎ নির্ঘাত জাহাজ মিস করব। এই শেষ টেন ছিল আমাদের শেষ ভরসা।

এ দুঃসংবাদ শুনে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লুম।

কিন্তু ভগবান মানুষকে নিয়ে এ রকম নীলা-খেলা করেন কেন? সেই যদি সুয়েজ বন্দরে আটক হতে হল সেই যদি বোট মিস করতে হল, তবে ঐ হেলথ সার্টিফিকেটের প্রথম খোঁয়াড়ে আটকা পড়লেই তো হত। সে ফাঁড়া কাটিয়ে এসে এখানে আবার কানমলা খাবার কি প্রয়োজন ছিল?

শুনেছি, কোনো কোনো জেলার ফাঁসির আসামীকে নাকি গারদের দরজা সামান্য খুলে রেখে জেল থেকে পালাবার সুযোগ দেয়। আসামী ভাবে জেলার বেথেয়ালে দরজা খুলে রেখে গিয়েছে। তারপর অনেক গা ঢাকা দিয়ে, একে এড়িয়ে ওকে বাঁচিয়ে যখন সে জেলের বাইরে মুক্ত বাতাসে এসে ভাবে সে বেঁচে গেছে ঠিক তখনই তাকে জাবড়ে ধরে দুই পাহারাওয়াল—সঙ্গে জেলার তাকে চুমো খেয়ে বলে, 'ভাই জীবন কত দুঃখে ভরা। তার থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে কাল ভোরে। আহাম্মুখের মতো সে-নিষ্কৃতি থেকে এই হয়ে নিষ্কৃতির চেষ্টা তুমি কেন করছিলে, সখা?'

পরদিন তার ফাঁসি হয়।

আমার মনে হয়, ফাঁসির চেয়েও ঐ যে জেলের বাইরে ধরা-পড়া সেটা অনেক কঠোর, কঠিন নির্মম।

কারণ, মৃত্যু সে তো কিছু কঠিন কঠোর অতিজ্ঞতা নয়। ডাক্তাররাও বলেন, রোগে মানুষ কষ্ট পায় কিন্তু ঠিক প্রাণত্যাগ করার সময় মানুষ কোনো বেদনা অনুভব করে না।

তাই গুরুদেব বলছেন,—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়

জয় অজানার জয়!"

ঠিক সেই রকমই এক মহাপুরুষ—হিটলারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলে ঐ ফাঁসির হুকুম হয়—জেলে বসে কবিতা লিখেছিলেন,

ছু কান্ সট্ উনস্ ডুর্ষ ডেস টেডেস ট্যারেন

ট্রয়েমেজ্ ফ্যুরেন্

উনট্ মাখসট্ উনস্ আউফ্ আইনমাল্ ফ্রাই।

তুমি আমাদের মৃত্যুর দ্বার দিয়ে হাতে ধরে নিয়ে চল।

—আমরা যেন স্বপ্নে চলছি—

ইঠাৎ দেখি, আমরা স্বাধীন।

এই বই ছোটদের জন্য লেখা। তারা হয়তো শুধাবে, মৃত্যুর কথা তাদের শোনাচ্ছে কেন? আমার মনে হয়, শোনানো উচিত। সাধারণত বড়রা ছোটদের যত আহাম্মুখ মনে করেন আমি বুড়ো হয়েও সে রকম ভাবি নে।

আমার বয়স যখন তেরো, তখন আমার সব চেয়ে ছোট ভাই বছর দুয়েক বয়সে মারা যায়। ভারী সুন্দর ছেলে ছিল সে। আমার কোলে বসতে বড় ভালোবাসত। ঐ দু বছর বয়সে সে আমার সাইকেলের রডে বসে হ্যাভেল আঁকড়ে ধরে থাকতো আর আমি বাড়ির লেনে পাক লাগাতুম। মাঝে মাঝে সে খল-খল করে হেসে উঠত আর মা বারানায় দাঁড়িয়ে খুশী হয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন কিছু মাঝে মাঝে বলতেন, 'থাক হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

একদিন সে চলে গেল।

আমি বড় কষ্ট পেয়েছিলুম।

তখন আমায় কেউ বুঝিয়ে বলেনি, মৃত্যু কাকে বলে? তার অর্থ যদি তখন আমাকে কেউ বুঝিয়ে বলত তবে বেদনা লাঘব হত।

বড়রা ভাবেন, ছোটদের বেদনাবোধ কম। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তোমরা যারা আমার বই পড়ছ, তোমাদের কেউ কি ভাই-বোন হারাও নি? সে বুঝবে।

কবি গুরুর ছোট ভাই বোন ছিলেন না। ভাই বিখ্য মানি তিনি কি করে লিখলেন।

কাকা বলেন সময় হলে

সবাই চলে

যায় কোথা সেই স্বর্ণপারে।

বলতো কাকী

সত্যি তা কি একেবারে?

তিনি বলেন, যাবার আগে

তল্লা লাগে

ঘন্টা কখন ওঠে বাজি

দ্বারের পাশে

তখন আসে

ঘাটের মাঝি।

বাবা গেছেন এমনি করে

কখন ডোরে

তখন আমি বিছানাতে।

তেমনি মাখন

গেল কখন

অনেক রাতে। \*

এই কাকাটি সত্যি ছোট ছেলের বেদনা বুঝতেন।

\* শিশু জ্ঞানানুশীলন, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড ১০৮ পৃঃ।

কিন্তু মূল কথা থেকে কত দূরে এসে পড়েছি। ভাই মৃত্যু সঙ্কে শেষ কথা বলে মূল কথায় ফিরে যাই। ভগবানে আমার অবিচল বিশ্বাস। ভাই আমি জানি আমি যখন মরণের সিংহাসন পার হব তখন দেখব বাবা ঠাকুরদা, তাঁর বাবা তাঁর বাবা আরো কত শত উর্দ্ধ পুরুষ সৌম্যবদনে এগিয়ে আসছেন আমাকে তাঁদের মাঝখানে বরণ করে দেবার জন্য। এবং জানি, জানি নিশ্চয় জানি তাঁদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মা আমার ছোট ভাইকে হাসিমুখে কোলে নিয়ে। তার চেয়েও আশ্চর্য বোধ হয় তখন মনের চোখে ছবি দেখি, আমার এই ছোট ভাই একদা টলটলায়মান পায়ে আমার মায়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তাকে আপনজনের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য, তার কোলে ওঠার জন্য। সে তো ওলোকে গিয়েছিল মায়ের বহু পূর্বে।

আমি যখন সে লোক যাবো তখন ভগবান শুধাবেন 'তুমি কি চাও?' আমি ভৎসনাৎ বলবো, 'একখানা বাইসিকেল।' পাওয়া মাত্রই তাতে ভাইকে রডে চড়িয়ে স্বর্গের লেনে চক্কর লাগাবো। সে খল খল করে হাসবে। মা দেখবে কিন্তু ককখনো বলবে না 'থাক হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

অতএব সব বিপদ থেকেই নিষ্কৃতি আছে। গাড়ি গেছে তো গেছে তাতে ভয় পাবার অণু কি?

দেখি, আবুল আসফিয়া নেই।

আমাদের এই অকূল সমুদ্র আর অস্তহীন মরুভূমির মাঝখানে ফেলে দিয়ে লোকটা পালান নাকি?

পেশনের বাইরে তাঁর খোঁজ করতে এসে দেখি, তিনি এক জরাজীর্ণ মোটরগাড়ির ডাইভারের সঙ্গে রসালাপ আরম্ভ করেছেন। অনুমান করলুম তিনি ট্যাকসি- যোগে কাইরো পৌছবার চেষ্টাতে আছেন।

কিন্তু ট্যাকসিওয়ালা আমাদের মজ্জমান অবস্থা বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছে এবং যা দর হীকছে তা দিয়ে দুখানি নতুন টায়ারি কেনা যায়।

আবুল আসফিয়া তাকে বহুতর ধর্মের কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করলেন, ততোধিক ভারত মিশরীয় মৈত্রীর অকুণ্ঠ প্রসংসা করলেন এবং সর্বশেষে তিনি মুসলমান সেও মুসলমা, সে-সত্যের দোহাই কসম খেলেন কিন্তু ট্যাকসিওয়ালাটি ধর্মে মুসলমান হলেও কর্মে খাঁটি দুর্যোধন। বিনা যুদ্ধে সে সূচাত্ম পরিমাণ ভূমি এগোবে না।

আবুল আসফিয়ার চোখে-মুখে কিন্তু কোনো উদ্ভার লক্ষণ নেই। ভৃগু-পদাহত ভিত্তিস্থ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি তখন চললেন হেলথ অফিসের দিকে। আমিও পিছু নিলুম।

সেই বিরাট-বপু, ভদ্রলোক, যিনি আমাদের সার্টিফিকেট দিয়ে প্রথম ফাঁড়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন। এবার তাঁকে জাগাতে গিয়ে আবুল আসফিয়াকে ব্রীতিমত্ত বেগ পেতে হল।

তাকে তখন তিনি যা বললেন, তার সরল অর্থ, তিনি ডাকাতকে ডরান না, ডাকাত বন্দুক উঠলে তিনিও বন্দুকে তুলতে জানেন কিন্তু এ রকম বন্দুকহীন ডাকাতের বিরুদ্ধে লড়াবার মতো ইতিয়ার তো তাঁর নেই। অবশ্য তিনি ঘাবড়ান নি, কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই, তবে কি না অফিসারটি যদি একটু সাহায্য করেন তবে আমাদের উপকার হয়, তাঁরও পূণা হয়।

অফিসার বললেন, 'চলুন।'

তিনি ট্যাকসিগুলোর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলেই আমাদের জানালেন কত দিতে হবে। হিসেব করে দেখা গেল, গাড়িতে কাস্ট ক্লাসে যা লাগতো, ট্যাকসিতে তাই লাগবে। আমরা তাতেই খুশী। কাইরো তো পৌছব, পোর্টসাইদে তো জাহাজ ধরতে পারব, তবে আর ভাবনা কি?

আমরা হুড়মুড় করে দুখানা ট্যাকসিতে কাঁটাল বোঝাই হয়ে গেলুম।

আমি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঠার সময় বললুম, 'আপনি আমাদের জন্য এতখানি করলেন, সত্যি আপনার দয়ার শরীর।'

তিনি ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে যা বললেন তা শুনে আমি অবাক। তার অর্থ তাঁর শরীর আদর্শেই দয়ার শরীর নয়। তিনি কিছুমাত্র পরোপকার করেন নি। আমরা এক পাশ ভিখিরী যদি সুয়েজ বন্দরে আটকা পড়ে যাই তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই ঘাড় পড়বে। আমাদের ভাড়াতে পেলে তিনি বেঁচে গেছেন—ইত্যাদি।

আমি আপত্তি জানিয়ে মোটরে বসে ভদ্রলোকের কথাগুলো ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা কি—বহুদিন পূর্বকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যাওয়াতে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাঙা-ধরা ছিলেন তাঁর দাদার নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার এক চিত্রকর বন্ধু বিনোদবিহারী এক দিন তাঁর দূরবীনটি ধার নিলে—বেচারী চোখে দেখতে পেত কম। কয়েকদিন পরে সেটা ফেরত দিতে গেলে দিনুবাবু, জিজ্ঞেস করলেন 'কি রকম দেখলে?'

'আজ্ঞে, চমৎকার!' বিনোদ এত দূরের জিনিস এর আগে কখনো দেখতে পায় নি।

'তবে ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। লোকে বড্ড জ্বালাতন করে। আজ এটা এ চায়, কাল ওটা ও চায়, পরশু, ওটা সে চায়। আমি পেরে উঠি নে। তোমার কাছে ওটা থাক।'

বিনোদ একাধিকবার চেষ্টা করেও সে দূরবীন ফেরত দিতে পারে নি।

এই হল খানদানী লোকের পরোপকার করার পদ্ধতি। সে দেখায়, যেন সে আদর্শেই পরোপকার করে নি। নিতান্ত নিজের মঙ্গলের জন্য, আগাগোড়া সে স্বার্থ পরের মতো কাজ করেছে।

বুঝলাম এ অফিসারটিও দিনুবাবুর সগোত্র। ইস্তে করেই 'সগোত্র' শব্দটি ব্যবহার করলুম; আমার বিশ্বাস ইহ-সংসারের যাবতীয় ভদ্রলোক একই গোত্রের—তা তাঁরা ব্রাহ্মণ হন আর চন্ডাল হন হিন্দু হন আর মুসলমান হন কাফ্রী হন আর নর্ডিক হন।

ততক্ষণে আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিশ্চয় হয়ে আসছে—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো স্মৃতি যে রকম আবছায়া-আবছায়া হতে থাকে।

১৬

মরুভূমির উপর চম্ভালোক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সে দৃশ্য বাংলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না। তবে যদি কখনো পদ্মার বিরাট বালুচড়ায় পূর্ণিমা রাতে বেড়াতে যাও—রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন এবং 'নিশীথে' গল্প তারি পটভূমিতে লেখা—তাহলে তার খানিকটে আশ্বাদ পাবে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভুতুড়ে বলে মনে হয়। চোখ চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে অথচ হঠাৎ যেন ঝাপসা আবছায়ার পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক ঠিক দেখতে পারছি নে চিনতে পারছি তবু ঠিক ঠিক চিনতে পারছি নে। চতুর্দিকে ফটফটে জ্যোৎস্নার আলো যেন উপচে পড়ে, মনে হয় এ আলোতে অক্রেপে খবরের কাগজ পড়া যায় অথচ এ আলোতে লাল কালোর তফাত যেন খুঁচতে চায় না। মেঘলা দিনে এর চেয়ে অনেক ক্ষীণলোকে রঙের পার্থক্য অনেক বেশী ধরা পড়ে। তাই,

মনে হল পাখি, মনে হল মেঘ, মনে হল কিশলয়,

ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।

দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি অথবা তরঙ্গ মূল।

অথবা এ শুধু আকাশে জুড়িয়ে আমারই মনের ভুল?

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু মাথা উঠতে ফুটে ওঠে, জ্বল জ্বল দুটি ছোট সুবজ আলো ওগুলো কি? ভূতের চোখ নাকি? শুনেছি ভূতের চোখ সবুজ রঙের হয়। নাঃ! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাতান—এদেশের ভাষাতে যাকে বলে 'কাফেলা' (কবি নজরুল ইসলাম এ শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করেছেন)। উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়তে চোখ দুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। দেশে গোরু-বলদের চোখে আলো পড়ে ঠিক এ রকমই হয়, কিন্তু বলদের চোখে যে লেভেলে দেখি উটের চোখে তার অনেক উপরে দেখতে পেলুম বলে এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আর কেনই পার না বল? জনমানবহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছ, রাত্রিবেলা—আবার বলছি রাত্রিবেলা। মরুভূমি সষক্কে কত গল্প কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তুম্বায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিকৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, সেখান থেকে উটের জমানো জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তুম্বায় মতিঙ্গনু হয়ে গিয়ে সে হঠাৎ কাপড় চোপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সূর্যের দিকে জিত দেখিয়ে দেখিয়ে নাচে আর শুককণ্ঠে বীভৎস গলায় গান জোড়ে,

তুই আমার কি করতে পারিস তুই ক্যা রে?

তুই—(অশ্লীলবাক্য)—তুই ক্যা রে?

এবং তার চেয়েও বদখন্দ বেতাল 'পদা'।

যদি মোটর তেঙে যায়? যদি কাল সন্ধ্যা অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? পষ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ী রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয়নি, তখন কি হবে উপায়?

কিন্তু করুণাময়কে অসীম ধন্যবাদ; পল-পার্সি দেখলুম অন্য ধরনের ছেলে। তারা সেই জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির কটকটহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিনহ ধাবহি তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে বানরদের কলরোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ট'-এর অনুশ্রাস ব্যবহার করেছেন। শব্দ ছাপিয়ে বিকটতর কটকট করছে। তাদের কী আনন্দ।

পলঃ 'সব-কিছু ভালো করে দেখে নে। মাকে যাবতীয় জিনিস যেন গুছিয়ে লিখতে পারি।'

পার্সিঃ 'তোমার জীবনে এই তুই প্রথম একটা খাঁটি কথা কইলি। কোনো জিনিস যেন বাদ না পড়ে। ওঃ মরুম্ভুমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কখনা করতে পেরেছিলুম। জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোকটে মরুম্ভুমির ভিতর দিয়ে চড়ে যাবো?'

পলঃ 'ঠিক বলেছিস। আর মা-বাবা কী রকম আশ্চর্য হবেন ভাব দিকিনি। কিন্তু, ভাই ওনারা যদি তখন ধমক দেন, জাহাজ ছেড়ে তোমরা এ রকম বাড়িভুলীপনা করতে গিয়েছিলে কেন? তখন?'

পার্সি বললেঃ 'ঐ তোর দোষ! সমস্তক্ষণ ভয়ে মরিস। তখন কি আর একটা সদুত্তর খুঁজে পাবো না। ঐ স্যার রয়েছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না। উনি কি বলেন।'

আমি বললুমঃ 'দোষ দেবেন তো তখন দেবেন। এখন সে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবার জিনিস অবহেলা করবে নাকি? বিশেষত, যদি আমাদের অভিযান অন্যায় কর্মই হয়ে থাকে সেটাকে যখন রদ করার শক্তি আমাদের হাতে নেই।'

পার্সি বললেঃ 'আর ফিরে গিয়েই বা কি লাভ? আমাদের জাহাজ তো অনেকক্ষণ হল ছেড়ে দিয়েছে।'

চলুক ছেলে, সবদিকে খেয়াল রাখে।

মরুম্ভুমিতে দিনের বেলা যে রকম প্রচণ্ড গরম, রাত্রেও ঠিক তেমনি বিকট শীত। বৈজ্ঞানিকেরা তার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেন বটে, কিন্তু খোপে সেটা কতখানি টেকে আমি যাচাই না করে বলতে পারব না। উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি, জাহাজে দিনের পর দিন রাতের পর রাত দুঃসহ গরমে হাড়মাংস যেন আচার হয়ে গিয়েছিল; ঠান্ডা বাতাসের পরশ পেয়ে সর্বাত্মক যেন জ্বলে-ডেজা জুই ফুলের মতো ফুলে উঠল।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একাধিকবার হয়েছে। পেশাওয়ার, জালালাবাদের ১২০/১২২ ডিগ্রী সওয়ার পর আমি খাক-ই-জব্বারের ৬০

ডিগ্রীতে পৌছতে কী আরাম অনুভব করেছিলুম সে অন্যত্র বর্ণনা করছি। কোথায়? উই সেটি হচ্ছে না। বললেই বলবে, আমি সুযোগ পেয়ে আমার অন্য বইয়ের বিজ্ঞাপন এখানে নির্ধরচায় চালিয়ে দিচ্ছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। যখন মোটরের হঠাৎ একটুখানি জোর কীকুনিতে ঘুম ভাঙল তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো। কাইরো পৌছে গিয়েছি। গাড়ির আর সবাই তখনো ঘুমচ্ছে। আমার সন্দেহ হল ডাইভারও বোধ করি ঘুমোচ্ছে। গাড়ি আপন মনে বাড়ির দিকে চলেছে, সোয়ার ঘুমিয়ে পড়লেও ঘোড়া যে রকম আপন বাড়ি খুঁজে নেয়।

পার্সিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বললুমঃ 'তবে না বৎস বলেছিলে মরুম্ভুমির টুকটাকি পর্যন্ত মনের নোট বুকে টুকে নেবে?' যেন আমি নিজে কতই না জেগে ছিলাম।

পার্সিও তালেবর ছেলে। তখখুনি দিলে পলের কানে ধরে একখানা আড়াই গজী টান। আমি পার্সিকে যা বলেছিলুম সে পলকে তাই শুনিয়ে দিলে। পল বেচারী আর কি করে? সে আন্তে আন্তে মাদমোয়াজেল শোনয়েকে জাগিয়ে দিয়ে বললে 'কাইরো পৌছে গিয়েছি।'

বাঙাল দেশে কথায় কয়-পশ্চিম বাঙলায় বলে কিনা জানিনে—'সামেব বিবিকে মারলেন চড়, বিবি বাদীকে দিলেন ঠাঙ্গা, বাদী বেরালকে মারলে ল্যাথি, বেরাল খামছে দিলে নুনের ছালাটাকে।'

সংসারে এই রীতি।

এখানে অবশ্য প্রবাদ টায়টায় মিলল না। তাই পল অতি সবিনয়ে মেমসাহেবকে জাগিয়ে দিলে।

মাদমোয়াজেল হ্যান্ডব্যাগ থেকে পাউডার বের করে নাকে ঘষতে ঘষতে ফরাসীতে শুধালেন, আমার বিশ্বাস ফরাসিনীরা ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঠোটে লিপস্টিক লাগাতে পারেন এবং লাগান—'আমারা কোথায় পৌছলুম, মসিয়ো?'

'ল্য ক্যার।'

পল বেশ খানিকটে ফরাসী জানতো। আমাকে শুধালেঃ 'ল্য ক্যার' অর্থ হল 'দি কাইরো।' 'ল্য'টা আবার পুংলিঙ্গ। একটা শহরের আবার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ কি করে হয়?

আমি বললুমঃ 'অত বিদ্যো আমার নেই, বাপু! তবে এইটুকু জানি এ বাবদে ফরাসীই একমাত্র আসামী নয়। আমরা বক্ষপুত্রকে বলি নদ, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ এবং গঙ্গাকে বলি নদী অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। কেন বলি জানি নে।'

পার্সি বললেঃ 'আমরা ইংরেজরাই বা জাহাজকে 'শী' অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ দিয়েছি কেন?'

আমি বললুমঃ 'উপস্থিত এ আলোচনা অকসফোর্ডের জন্য মূলত্ববী রেখে দাও—সেখানেই তো পড়তে যাচ্ছে—এবং নিশির কাইরোর সৌন্দর্যটি উপভোগ করে নাও।'

সত্যি, এরকম সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা যখন চন্দননগর থেকে কলকাতা পৌঁছই তখন মার্কসানে ঘন বসতি আর কিস্তির জোরালো ব্যতি থাকে বলে কলকাতার রোশনাই ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি নে। এখানে মরুভূমি পেরিয়ে হঠাৎ শহর বলে একসঙ্গে সব কটা আলো চোখে পড়ে এক অদ্ভুত মরীচিকার সৃষ্টি করে।

ছ-তলা বাড়ির উপরে—অবশ্য বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না—দেখি, লাল আলোতে জ্বালানো শেলাইয়ের কলের চুঁচ ঘন ঘন উঠছে, নামছে, আর সবুজ আলোর চাকা ঘুরেই যাচ্ছে ঘুরেই যাচ্ছে। নিচে এক বিলিতি কোম্পানীর নাম। আমার মনে হল হয়। কলটার নাম যদি 'উবা' হত। সেদিন আসবে সেদিন ভারতীয়—যাক সে।

আরো কত রকমের প্রজ্জ্বলিত বিজ্ঞাপন। এ বিষয় কলকাতা কাইরোর পিছনে। করে করে শহরতলীতে ঢুকলুম। কলকাতার শহরতলী রাত এগারোটায় অঘোরে ঘুমোয়। কাইরোর সব চোখ খোলা—অর্থাৎ খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। আর রাত্তার কথা বাদ দাও। এই শহরতলীতেই কত না রেস্তোরা কত না 'কাফে' খোলা, বন্ধেরে বন্ধেরে গিসগিস করছে। আমাদের যে রকম চায়ের দোকান, মিশরীদের তেমনি 'কাফে' অর্থাৎ কফির দোকান। আমি প্রায়ই ভাবি কফির দোকান যদি 'কাফে' হতে পারে তবে চায়ের দোকান 'চাফে' হয় না কেন? 'চলো ভাই চাফেতে যাই বলতে কি নেব?'

আবার বলছি রাত তখন এগারোটো। আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখেছি কিন্তু কাইরোর মতো নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়ে নি।

কাইরোর রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম-ম করছে। মাঝে মাঝে নাক এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয় নেমে পড়ে এখানেই চাটি খেয়ে বাই। অবশ্য রেস্তোরাগুলো আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানেরই মতো নোহো। তাহলে কি যায় আসে? কে যেন বলছে, 'নোহো' রেস্তোরাতেই রান্না হয় ভালো, কালো গাই কি সাদা দুধ দেয় না?'

আমার খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এসব সায়েব-মেমরা যখন রয়েছেন। তাঁরা 'ম' দিয়ে 'হ্যার গট' কি বললেন তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই।

আচম্বিতে দুখানা গাড়িই দাঁড়ালো। বসে বসে সবাই সাড় হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যাই নেমে পড়লুম। সন্ধ্যার মনে এক কামনা। আড়াযোড়া দিয়ে নি, পা দুটো চালিয়ে নি হাত দুখানা ঘুরিয়ে নি।

এমন সময় আবুল আসফিয়া আমাদের মার্কসানে দাঁড়িয়ে, মাথা পিছনের দিকে ইকং ঠেলে দিয়ে, হাত দুখানা সামনের দিকে সম্প্রসারিত করে, পোলিটি-শিয়নদের কায়দায় প্রজ্ঞানন্দ-পাকী লেকচার ঝাড়তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে—

'মেদাম, মেদমোয়াজেল এ মেসিয়ো—'

( তদমহিলাগণ তদকুমারীগণ এবং তদমহোদয়গণ )

আমরা সকলেই একগুণে তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত। নগরী প্রবশ করতঃ আমরা

গথমেই উত্তম কিংবা মধ্যম শ্রেণীর ডোজনাগয়ে আহারাদি সমাপন করব। কিন্তু ব্রহ্ম, সেখানে বেতে দেবে কি? জাহাজে যা দেয় তা-ই। সেই বিশ্বাস সুপ, বিশ্বাসভর ই তদিতর পুড়ি। অর্থাৎ সেই আখলা-ইন্ডিয়ান কিংবা আখলা-ইন্ডিয়ান—যাই বলুন-রস-কবহীন খানা।

পক্ষান্তরে 'এই শহরতলীতে যদি আমরা কিফিং আদমি এবং অকৃত্রিম মিশরীয় খাদ্য, মিশরীয় পদ্ধতিতে সুপক্ক খাদ্য, ভোজন করি তবে কি এক নতুন অভিজ্ঞতা সক্ষম হবে না?'

আমরা কিছু বলার পূর্বেই তিনি হাত দুখানা গুটিয়ে নিয়ে বী হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকোতে চুলকোতে বললেনঃ 'অতি অবশ্য, রেস্তোরাগুলো নোহো। চেয়ার-টেবিল সাফ সুব্রো নয় কিন্তু মেদাম, মেদমোয়াজেল, মেসিয়ো, আমরা তো আর টেবিল চেয়ার খেতে যাচ্ছি নে। আমরা খেতে যাচ্ছি খাদ্য। জাহাজের রান্না যখন আমাদের খুন করতে পারে নি তখন এ রান্নাই বা করবে কি করে? আপনাই বলুন।'

কেউ কিছু বলার পূর্বেই পার্সি চেঁচিয়ে উঠলোঃ 'আফকোস, অফকোস—আলকং, আলকং আমরা নিচ্চই যাব। আমরা যখন মিশরীয় হাওয়াতেই শ্বাস নিচ্ছি, মিশরীয় জলই খাব, তখন মিশরীয় খাদ্য খাবো না কেন?'

মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বললেনঃ 'যীরা খেতে চান না, তীরা খাবেন না। আমি যাচ্ছি।'

আর আমি বুতলুম, ফরাসী দেশটা কতখানি স্বাধীনতার দেশ। স্বাধীনতা ফরাসীদের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায়।

শেনিয়ে ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ডেলিকট প্রাণী। জাহাজের রান্না তাঁর পছন্দসই ছিল না বলে তিনি টোস্ট, দুধ, ভিৎ, মটর, কপি, আলুসেদ্ধ খেয়ে প্রাণ ধারণ করতেন। তিনি যখন রাজী তখন—?

আমার মনে হয়, আমরা যে তখন সবাই নিকটতম রেস্তোরাই হড়মুড় করে ঢুকলুম তার একমাত্র কারণ এই নয় যে, মাদমোয়াজেল ঢুকতে পঙ্কুত, আমার মনে হয় আর সবাইও তখন মিশরী খানার এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্য তৈরী। এবং সর্বোত্তম কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় ঝাড়র। কোথায় কোন খানদানী রেস্তোরাই কখন পৌঁছব তার কি ঠিক ঠিকানা? সেখানে হয়তো এতকণে সব মাল কাবার। খেতে হবে মাখন-কুটি, দিতে হবে মুগী-মটনের দর। তার চেয়ে ভর-ভর খুশবাইয়ের খাবারই প্রশস্ততর। হাতের কাছে যা পাচ্ছি, তাই ভালো সেই নিয়ে আমি খুশি।

রবি ঠাকুর বলেছেন,

'কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন

দূরের দুরাশাতে?'

ইরানী কবি গুরম বৈয়ামও বলেছেন,

Oh, take the Cash, and let the Credit go,

Not heed the rumble of distant Drum!



কান্তি ঘোষ তার বাঙলা অনুবাদ করেছেন,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক,  
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বজায় ফীক!'

রেস্তোরিগুলো ছুটে এসে আমাদের আদর কদর করে অভ্যর্থনা (ইসতিক্বাল) জানালে। তার 'বয়-রা' বত্রিশখানা দাঁতের মূলো দেখিয়ে আকর্ষণ হাসলে। তড়িত্তি তিনখানা ছোট ছোট টেবিল একজোড়া করে, চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হল, রান্নাঘর থেকে স্বল্প বাবুচী ছুটে এসে ভোয়ালে কীধে বার বার খুঁকে খুঁকে সেলাম জানালে। বসতে গিয়ে দেখি, শ্যামবাজারের সেই লোহার চেয়ার। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বসতে গেলে ছীকা দেয়।

আমি তখন আমার অভিজ্ঞতা গিলছি। অর্থাৎ দেখছি, বয়গুলোর কী সুন্দর দাঁত। এরকম দুধের মতো সুন্দর দাঁত হয় কি করে? সে দাঁতের সামনে এরকম রক্তকরবীর মতো রঙা ঠোঁট এরা পেল কোথা থেকে? এবং ঠোঁটের সীমান্ত থেকেই সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে কী অমৃত এক নীবন রঙ! এ রঙ আমার দেশের শ্যামল নয়, এ যেন কি এক বোজা রঙ! কী মসৃণ কী সুন্দর!

কিন্তু সর্বাধিক মনোরম বাবুচীর ভুঁড়িটা। ওঃ! কী বিশাল, কী বিপুল, কী জীদরেশ!

তার থেকেই অনুমান করলুম আমরা ভালো রেস্তোরিতেই চুকছি।

ইতিমধ্যে আবুল আসফিয়া এবং মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বাবুচীকে নিয়ে খুদ রান্নাঘরে চলে গিয়েছেন, আহারাতির বাছাই তদারক করতে এবং গোটাচারেক ছোকরা এসে আমাদের চতুর্দিক ঘিরে চোঁচাচ্ছে 'বুং, বালিশ, বুং বালিশ!'

সে আবার কি যন্ত্রণা? ! ? !

বুংতে বেশীক্ষণ সময় লাগলো না, কারণ এদের সকলের হাতে কাঠের বাস্ত্র আর গোটা দুই করে বুরশ। ততক্ষণে আবার মনে মনে, ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করে বুঝে নিয়েছি, আরবীতে 'ট' নেই বলে 'বুট' হয়ে গিয়েছে 'বুং' এবং 'প' নেই বলে 'পলিশ' হয়ে গিয়েছে 'বালিশ'—একুনে দাঁড়ালো 'বুং বালিশ!' তাই আরবরা পণ্ডিত জওয়াহরশালের নাম উচ্চারণ করে 'বালিশ জওয়াহরশাল।' ভাগ্যিস আরবী ভাষায় 'ট' নেই। থাকলে নিরীহ 'পণ্ডিত' আরবীস্থানের 'ব্যাকটিট' হয়ে যেতেন! আদন অঞ্চলের আরবীতে আবার 'গ' নেই। তাই তারা 'গান্দীর' নাম উচ্চারণ করে 'জান্দী।' অবশ্য সেটা কিছু মন্দ নয়,—সত্যের জন্য 'জান দি' বলেই তো তিনি প্রাণ দান করে দেহত্যাগ করলেন।

বাঙালী তেড়ি কাটতে বাস্ত্র, ইয়েজ সমস্তক্ষণ টাইটা ঠিক গলার মাঝখানে আছে কিনা তার তদারকিতে বাস্ত্র, শিখেরা পাগড়ী বীধাতে ঘটাখানেক সময় নেয় কাবুপীরা হামেশা জুতোতে পেরেক ঠোকাতে ব্যতিব্যস্ত, আর কাইরোবাসীরা দেখলুম, 'বুং বালিশের' নেশাতে মশগুল। তা না হলে রাত দুপুরে গভায় গভায় বুং-বালিশওয়ালারা কাফে রেস্তোরায় ধনা দিতে যাবে কেন?

তবে হ্যাঁ, পালিশ করতে জানে বটে। স্পিরিট দিয়ে পুরনো রঙ ছাড়ালে, সাবানজল দিয়ে অন্য সব ময়লা সাফ করলে, ক্রীম লাগালে, পালিশ ছোঁয়ালে, প্রথম হাল্কা ক্যারিস পরে মোলায়েম সিঙ্ক দিয়ে জুতোর জৌশুস বাড়ালে। তখন জুতোর যা অবস্থা! তাতে তখন আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। বুরশের ব্যবহার তো প্রায় করলেই না—চামড়া নাকি তাতে যক্ষম হয়ে যায়।

কিন্তু আর্চর্ষ বোধ হল, সেই ঝাঁ চকচকে জুতোজোড়াকে সর্বশেষে কাপড় দিয়ে ঘষে অল্প-অতি অল্প-ম্যাটিমেটে করে দিল কেন? এতখানি মেহনত করে চাকচিকা জাগানোর পর সেটাকে ম্যাটিমেটে করে দেবার কি অর্থ?

একটা গল্প মনে পড়লো:

এক সাহেব পেসটিওলাকে অর্ডার দিলেন একটা জন্মদিনের কেক বানাবার জন্যে। কেকের উপর যেন সোনালি নীলে তার নামের আদা অঙ্কর পি. বি. ডাবলইউ লেখা থাকে। ডেলিভারী নেবার সময় দোকানদারকে বললেন, 'হ' কেকটি দেখাচ্ছে উত্তম, কিন্তু হরফগুলো বানানো হয়েছে সোজা অঙ্করে। আমি চাই ট্যারচা ধরনে, ফ্রাল ডিজাইনে।'

দোকানী খদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। বললে 'এক্ষুণি করে দিচ্ছি। জন্মদিনের ব্যাপার—চাটখানি কথা নয়।'

প্রচুর পরিশ্রম করে সে কেকের উপরটা চোঁচে নিলে। তারপর প্রচুরতম গলদঘর্ম হয়ে তার উপর হরফগুলো বীকা ধরনে অঁকলে, আরো মেলা ফুল ঝালর চতুর্দিকে সাজালে।

সাহেব বললেন, 'শাবাস, উত্তম হয়েছে।'

দোকানী খুশী হয়ে শুধালে, 'প্যাক করে আপনাকে দেব, না কোনো বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে?'

সাহেব হেসে বললেন, 'কোনোটাই না। আমি ওটা নিজেরই খাবো।'

বলেই ছুরি দিয়ে চাকলা চাকলা করে গব-গব করে আশু কেকটা গিললেন।

দোকানী তো থ। তা হলে অত শত করার কি ছিল প্রয়োজন?

বুং বালিশের বেলাও তাই।

বুং বালিশগুলোকে শুধালুম, পালিশ কমিয়ে দেওয়ার কারণটা কি?

একুখানি হকচকিয়ে সামলে নিয়ে বললে 'গাইয়ারাই শুধু অত্যধিক চাকচিকা পছন্দ করে। শহরের উদ্যোগ সব জিনিসেরই মেকদার মেনে চলেন।'

অ-অ-অ-।

তখন মনে পড়লো, অবন ঠাকুরও বলেছেন, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আশের দিনে সোনার গয়না পরে পাক্ষিতে বেরুবার সময় তার উপর মলমলের পট্টি বেঁধে দিতেন। বড় বেলী চাকচিকা নাকি গ্রাম্যজনসুলভ বর্বরতা!

আমরা তেতো, নোনা, কাল, টক, মিষ্টি এই পাঁচ রস দিয়ে ভোজন সমাপন করি। ইংরেজ খায় মিষ্টি আর নোনা; খাল অতি সামান্য, টক তার চেয়েও কম এবং তেতো জিনিস যে খাওয়া যায়, ইংরেজের সেটা জানা নাই। তাই ইংরিজি রান্না আমাদের কাছে ভীত। এবং বিশ্বাস বলে মনে হয়। অবশ্য ইংরেজ ভালো কেক পেস্টি-পুডিং বানাতে জানে—তাও সে শিখেছে ইতালিয়ানদের কাছ থেকে এবং এ-কথাও বলবো আমাদের সন্দেশ রসগোল্লার তুলনায় এসব জিনিস এমন কী, যে নাম শুনে মূর্ছা যাব?

মিশরীয় রান্না ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন-অবশ্য ভারতীয় মোগলাই রান্নার। আমি প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু বহু দেশে বহু রান্না খেয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, মোগলরা এ দেশে যে মোগলাই রান্নার তাজমহল বানালেন। এবং ভুলে চলে যে না সে রান্না তাঁর আপন দেশে নির্মাণ করতে পারেন নি, কারণ ওঁদের মাতৃভূমি তুর্কীস্থানে গরম মসলা গজায় না। তারই অনুকরণে আফগানিস্তান, ইরান, আরবীস্থান, মিশর-ইস্তক পেশন অবধি আপন আপন হুদে হুদে রান্নার তাজমহল বানাতে চেষ্টা করেছে। এ রান্নার প্রভাব পূর্ণ ইয়োরোপের গ্রীস, ইতালী, রুম্যানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, ইতালি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এ সব তত্ত্ব আমার বহু দিনকার পরের আবিষ্কার। উপস্থিত আবুল আসফিয়া আর ফ্রেন্ডস নিয়ে এলেন বারকোশে হস্তেক রকম খাবারের নমুনা। তাতে দেখলুম, রয়েছে মুগী মুসল্লম, শিক কাবাব, শামী কাবাব আর গোটা পাঁচ ছয় অজানা জিনিস। জানা জিনিসগুলো যে ঠিক ঠিক কলকাতাই খুশবাই নিয়ে এল তা নয়, কিন্তু তাতেই বা কি? জাহাজের আইরিশ স্টু আর ইটালীয়ান মাক্কারনি খেয়ে খেয়ে পেটে হো চড়া পড়ে গিয়েছে; এখন এ-সব জিনিসই অমৃত। আমার প্রাণ অবশ্য তখন কঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছে ভাজা, সোনামুগের ডাল, পটল ভাজা আর মাছের কোলের জন্য—অত শত বলি কেন, শুধু খোলভাতের জন্য—কিন্তু ওসব জিনিস হো আর বাংলাদেশের বাইরে পওয়া যায় না, কাজেই শোক করে কি লাভ?

তাই দেখিয়ে দিলুম, আমার কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন সেই বারকোশ থেকেই।

পাশের টেবিলে দেখি, একটা লোক তার প্রেটে দুটি শসা নিয়ে খেতে বসেছে। দুটি শসা—তা সে ফত তিন ডবল সাইজই হোক না—কি করে মানুষের সম্পূর্ণ ডিনার হতে পারে, বহু চিন্তা করেও তার সমাধান করতে পারলুম না। তাও আবার দোকানে ঢুকে, টেবিল চেয়ার নিয়ে, সস-চাটনি সাজিয়ে। আর ইংলন্ডের মতো 'খানদানী' দেশেও হো মানুষ রান্নায় দুটো আপেল কিনে চিবোয়—রেস্তোরীয় ঢুকে

সস-চাটনি নিয়ে সেগুলো খেতে বসে না। তবে কি এদেশ ইংলন্ডের চেয়েও খানদানীতর? এদেশে কি এমন সব সর্বশেষে আইন-কানুন আছে যে রান্নায় শসা বিক্রি বারণ, যে-রকম শিবঠাকুরের আপন দেশে,

'কেউ যদি পা পিছলে পড়ে,  
পায়দা এসে পাকড়ে ধরে,  
কাজীর কাছে হয় বিচার  
একশ টাকা দণ্ড তার।  
সেথায় সন্ধ্যা ছটার আগে,  
হাঁচতে হলে টিকিট লাগে;  
হাঁচলে পরে বিনা টিকিটে—  
দমদমাদম লাগায় পিঠে—  
কোটাল এসে নসিা ঝাড়ে—  
একশ দফা হাঁচিয়ে মারে।'  
কি জানি কি ব্যাপার!

এমন সময় দেখি, সেই লোকটা শসা চিবুতে আরম্ভ না করে তার মাথখানে দিলে দুহাতে চাপ। অমনি হড়হড় করে বেরিয়ে এল পোলাও জাতীয় কি যেন কিছু, এবং তাতেও আবার কি যেন মেশানো। আমি অবাক! হোটেলওয়ালকে গিয়ে বললুম, 'যা আছে ব্লকপালে, আমি ঐ শসাই খাব।'

এল দুখানা শসা। কীটা দিয়ে একটুখানি চাপ দিতেই বেরিয়ে এল পোলাও। সে পোলাওয়ের ভিতর আবার অতি ছোট ছোট মাংসের টুকরো (এদেশে যাকে বলা হয় 'কিমা') টমাটোর কুচি এবং গুঁড়ানো পনির। বুঝলুম এ-সব জিনিস পুরেছে সেক্স শসার ভিতর এবং সেই শসাটা সর্বশেষে ঘিয়ে ভেজে নিয়েছে। যেন মাছ পটলের দোশয়া-শুধু মাছের বদলে এখানাকার শসায় পোলাও, মাংস, টমাটো এবং চীজ। তার-ই ফলে অপূর্ব এই চীজ।

শসাকে চাক্কি করে পোলাওয়ের সঙ্গে মুখে দিয়ে বুঝলুম, একই গ্রাসে একই সঙ্গে ভাত, মাংস, সর্জী, ফল এবং 'সেভরি' খাওয়া হয়ে গেল।

আর সে কী সোয়াদ! মুখে দেওয়া মাত্র মাখনের মতো গলে যায়।

এ রকম পাঁচকে পাঁচ পদ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও খাই নি।

আরেকটা জিনিস খেলুম সে-ও অতুলনীয়। মিশরী সিম-বীচি। 'আলীবাবা' বায়স্কোপে যে সব বিরাট বিরাট উঁচু তেলের জালা দেখছি তারই গোটা দু-স্তিন সিমিতে ভর্তি করে সমস্ত রাত ধরে চালায় সিদ্ধকর্ম। সেই সিমিে অগ্নিভায়েল আর এক রকমের মসলা মিশিয়ে খেতে দেয় সকাল বেলা থেকে। আমরা খেলুম রান্না করে তার যা সোয়াদ!—এখনো জিভে লেগে আছে। আমাদের সিম-বীচি তার

১। সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল, পৃঃ ৩২ তৃতীয় সিগনেট সংস্করণ।

২। অসলে শসা নয়, একরকমের ছোট লাউ।

কাছে কিছুই না। পল পার্সিও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলে চীন দেশের সোয়াবীনও এর সামনে কেন, পিছনেও দাঁড়াতে পারে না।

শুনলুম এই সীম-বীচি গরীব থেকে আরম্ভ করে মিশরের রাজা দু-সক্সা খেয়ে থাকেন। হোটেলওলা বললে, পিরামিড-নির্মাতা এক ফারাও-মহারাজ নাকি এই বীন খেতে এত ভালোবাসতেন যে, প্রজ্ঞাদের বারণ করে দিয়েছিলেন তার কেউ যেন বীন না খায়! সাধে কি আর লোকে ফারাওদের খামখেয়ালি বলত?

শুনলুম এই বীনের আরবী শব্দ 'ফুল'।

পরের দিন সকাল বেলাকার ঘটনা। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ আছে বলে এই সুবাদেই বলে নি।

কাইরোতে ফরাসী, গ্রীক, ইতালি, ইংরেজ বসবাস করে বলে এক জাত-বেজাতের বিস্তার টুরিস্ট আসে বলে কাইরোর বহু দোকানী তরো-বেতরো ভাষায় সাইন বোর্ড সাজায়। পরদিন সকাল বেলা আমরা যখন শহরের অনাচে-কানাচে ঘুরছি তখন দেখি, এক সাই বোর্ডে লেখা—

FOOL'S RESTAURANT

পল, পার্সি, আমি একসঙ্গেই বোর্ডটা দেখেছিলুম। একসঙ্গেই খ মেরে দাঁড়িয়ে গেলুম। একসঙ্গেই অটহাস্য করে উঠলুম

"আহামুকদের রেস্টোরাঁ।"

বলে কি?

তখন হঠাৎ ঝাঁ করে আমার মনে পড়ল Fool শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে 'ফুল' অর্থাৎ 'বীন' অর্থাৎ 'সিমের-বীচি' অর্থে। 'আহামুক' অর্থে নয়। অর্থাৎ এ দোকানী উত্তম 'সিম-বীচি' বেচে। তারপর দোকানের সামনে আমরা ত্রিমূর্তি উকি-ঝুকি মেরে দেখি, যে কটি খন্ডের সেখানে বসে আছে তাদের সঙ্কলেরই সামনে শুধু সিম-বীচি- 'ফুল'—'Fool'।

হাসলে ভো?

আমিও হেসেছিলুম।

কিন্তু তার পর কলকাতা ফিরে—বহু বৎসর পরে—দেখি, এক দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা—

"কপির শিষ্টাড়া।"

অর্থাৎ ফুলকপির-পুর-দেওয়া শিষ্টাড়া। এই তো?

আমি কিন্তু 'কপি' শব্দের অর্থ নিলুম 'বীদর'। অর্থাৎ বীদরদের শিষ্টাড়া। তা হলে অর্থ দাঁড়ালো, ও দোকানে যারা শিষ্টাড়া খেতে যায় তারা বীদর। অর্থাৎ Fool's Restaurant তে যে রকম আহামুকরা যায়!

যেমন মনে করো যখন সাই- বোর্ডে লেখা থাকে,—

"টাকের ঔষধ"

তখন কি তার অর্থ, 'টাকা' দিয়ে ঔষধ তৈরী করা হয়েছে? তার অর্থ এ

ঔষধ টেকোদের জন্য। অতএব 'কপির শিষ্টাড়া' অর্থ ফুলকপি দিয়ে বানানো শিষ্টাড়া নয়, 'কপি'—বীদরদের জন্য এ শিষ্টাড়া!

বিজ্ঞাপনে মানুষ জানা অজানাতে—অজানাতেই বেশী—কত যে রসিকতার সৃষ্টি করে তার একটা সচিত্র কলেকশন করেছিল আমার এই ভাইপো। 'হবিটা' মন্দ নয়। তার মধ্যে একটি ছিল,—

বিসৃদ্ধ রাস্তনের হাটিয়াল।

মচ্ছ- 10

মাত্রশ- 110

নিড়ামিস- 1/10

যাক্ গো এসব কথা। আবার কাইরো ফিরে যাই। আহালাদি সমাধ করে আমরা ফের গাড়িতে উঠলুম। আবুল আসফিয়া দেখলুম ড্রাইভারদের নিজের পয়সা খাওয়ালেন। তারপর গাড়িতে উঠে বসলেন, 'কাইরোতে ট্যাক্সি চালাবার অনুমতি তোমাদের নেই। অথচ আমরা তোমাদের বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের যেখানে খুশী নিয়ে গিয়ে দুপয়সা কামাতে পারো।'

তারা তো প্রাক্তন প্রস্তাবখানা শুনে অত্যাধে আটখানা। কিন্তু আবুল আসফিয়া যে দর হাঁকলেন তা শুনে তাদের পেটের 'ফুল' পর্যন্ত আচমকা লাফ মেরে গলা পর্যন্ত নৌছে গেল।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, আবুল আসফিয়া ইতিমধ্যে কাইরোতে ট্যাক্সি ফি মাইলে কত নেয় তার খবরটা জেনে নিয়েছেন এবং হাঁকছেন তার চেয়ে অনেক কম। এবার তিনি ওদের বাণে পেয়েছেন। ওরা বেশী কিছু আপত্তি জানালেই তিনি অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন, 'তা ভাই, তোমরা যদি না যেতে চাও তবে যাবে না। আমি আর তোমাদের বাধ্য করতে পারি নে। তোমাদের যদি, ভাই, বড্ড বেশী পয়সা হয়ে যাওয়ায় আর কামাতে না চাও, তাহলে আমি আর কি করতে পারি বলো? আল্লা তালাও তো খুরআন শরীফে বলেছেন, 'সমুষ্টি সদ্গুণ।'

তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে, ভাইরা, আমরা তা হলে অন্য ট্যাক্সি নি। তোমরা সুখেই ফিরে যাও। আল্লা তোমাদের সঙ্গে থাকুন; রসূল তোমাদের আশীর্বাদ করুন কিন্তু ভাই, এ ক'ঘন্টা তোমাদের সঙ্গে কেটেছিল বড় আনন্দ।'

কেটেছিল আনন্দ না কষ্ট! পারলে আবুল আসফিয়া ওদের গলা কাটতেন।

কিন্তু আশ্চর্য হলুম লোকটার 'ভডামি' দেখে। গুটিকয়েক টাকা বাঁচাবার জন্য কি অভিনয়ই না লোকটা করলে!

আর পায়রার মতো বকবকানি! এবং এ সেই লোক যে জাহাজে যে ভাবে মুক্ত বন্ধ করে থাকতো তাতে মনে হত কথা বলা রেশনড হয়ে গিয়েছে।

ঠিক আবুল আসফিয়ার দরে নয়, তার চেয়ে সামান্য একটু বেশী রেটে তারা শেষটায় রাজী হল।

আবুল আসফিয়া মোগ্লাই কণ্ঠে বললেন, 'পিরামিড'। ততক্ষণে আমরা কাইরো শহরের ঠিক মাঝখানে ঢুকে গিয়েছি।



কোথায় লাগে কলকতা রাত বারোটোর সময় কাইরোর কাছে। গভায় গভায় রেস্তোরাঁ, হোটেল সিনেমা, ডান্স-হল, ক্যাবারে। খন্দেরে খন্দেরে তামাম শহ-রটা আবুজাব করছে।

আর কত জাত-বেজাতের লোক।

ঐ দেখ, অতি খানদানী নিগো। ভেড়ার লোমের মতো কৌকড়া কালো চুল, লাল লাল পুরু দুখানা ঠোঁট, বেচা নাক ঝিনুকের মতো দাঁত আর কালো চামড়ার কী অসীম সৌন্দর্য! আমি জানি এরা তেল মাখে না কিন্তু আহা ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন তেল ঝরছে। এদের চামড়া এতই সুচিক্কণ সুমসৃণ যে আমার মনে হয়, এদের শরীরে মশা-মাছি বসতে পারে না—পিছলে পড়ে মশার পা ছ থানা কম্পাউন্ড ফ্রেকচার হয়ে যায়, ছ মাস পড়ি বেঁধে হাসপাতালে থাকতে হয়।

ঐ দেখো সুদানবাসী! সবাই প্রায়ই ছ ফুট বহা। আর লম্বা আলখাল্লা পরেছে বলে মনে হয় দৈর্ঘ্য ছ ফুটের চেয়েও বেশী। এদের রঙ রোঞ্জের মতো। এদের ঠোঁট নিগোদের মতো পুরু নয়, টকটকে-লালও নয়। কিন্তু সবচেয়ে দেখবার মতো জিনিস ওদের দুখানি বাহ। একেবারে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে আজানুলব্বিত—অর্থাৎ জানুর শেষ পর্যন্ত যেখানে হাঁটুর হাড়িও অর্থাৎ 'নী-ক্যাপ' সেই অবধি।

খীরামচন্দ্রের বাহ ছিল আজানুলব্বিত এবং তার রঙ ছিল নবজলধরশ্যাম, কিংবা নবদুবাদলশ্যাম। তবে কি শ্যামবর্ণ কিংবা রোঞ্জ-বর্ণ না হলে বাহ এতখানি লম্বা হয় না। তবে কি ফর্সাদের হাত বেঁটে, শ্যামলিয়াদের হাত লম্বা? কে জানে! সুযোগ পেলে কোনো এক নৃতাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করতে হবে।

হঠাৎ দেখি, সম্মুখে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কান্ড! লোকে লোকারণা!

সমস্ত রাস্তা জুড়ে এত ভিড় যে দুখানা গাড়িকেই বাধা হয়ে দাঁড়াতে হল। আমি বারণ করার পূর্বেই পল পার্সি দুজনই লাফ দিয়ে উঠে গেল হুড়ের উপর। ওরা দেখতে চায় ভিড়ের মাঝখানে ব্যাপারটা কি। আমার ওসব জিনিস দেখবার বয়স গেছে। মাদমোয়াজেল ক্রুদেৎ শেনিয়ে পর্যন্ত উঠি উঠি করছিলেন। আমি তাঁকে বাইরে যেতে বারণ করলুম।

ইতিমধ্যে ধোড়-সওয়ার পুলিশ এসে রাস্তা খানিকটে সাফ করে দেওয়াতে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। পল-পার্সি হড় থেকে নেমে এসে আমার দু পাশে বসেছে।

আমাকে কিছুটা জিজ্ঞেস করতে হল না ব্যাপার কি। ওরা উত্তেজনায় তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। একসঙ্গে কথা বলছে। শেষটায় পলকে বাধা দিয়ে আমি বললুম 'পার্সি তুমিই বলো কি হয়েছিল?'

'ঐ যে আপনি দেখালেন সুদানবাসীদের, তাদেরই এক জন একটা ইংরেজ সেপাইয়ের গলা ধরেছে বা হাত দিয়ে আর ঠাস ঠাস করে চড় মারছে ডান হাত দিয়ে। গোরা কিছুই করতে পারছে না, কারণ সুদানীর হাত লম্বা বলে গোরাতে এমনই দূরে রেখেছে যে, গোরা তার গাল নাগাল পাচ্ছে না। এ রকম তো চললো মিনিট দু-তিন। তারপর পুলিশ এসে গোরাতে ধরে নিয়ে চলে গেল।'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'সুদানীই তো ঠ্যাঙাচ্ছিল; তাকে ধরে নিয়ে গেল না? যে মার খেল তাকে ধরে নিয়ে গেল, যে মার দিলে তাকে ধরে নিয়ে গেল না, এটা কি করে হয়?'

পল পার্সি সম্বরে বললে, 'সেই তো মজার কথা, স্যার! সাংহাই-টাংহাই কোনো জায়গাতে কেউ যদি গোরাতে ঠ্যাঙায়, তবে তাকেই ঠ্যাঙাতে-ঠ্যাঙাতে পুলিশ থানার নিয়ে যায় কেউ একবারের তরেও প্রশ্ন করে না দেখটা কার?'

আমি তখন ডাইভারকে রহস্য সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানালুম।

ডাইভার বললে, 'দারোয়ানীর কাজ এ-দেশে করে সুদানীরা। তাদের উপর কাইরোবাসীদের অসীম বিশ্বাস। কোনো সুদানী কখনো কোনো প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, এ কথা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমার কানে কখনও পৌঁছয় নি। এরা বড়ই ধর্মপ্রাণ। পাঁচওক্ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ যায়, তসবী জপে। আর বসে বসে বাড়ি আগলায়। এই যে সুদানী গোরাতে মার দিচ্ছিল, সে এক রেস্তোরাঁর দারোয়ান। গোরা রেস্তোরাঁয় খেয়ে-দেয়ে পয়সা না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বলে হোটেলওয়া তাকে চ্যালেঞ্জ করে খেল ঘুষি। তখন সুদানী দারওয়ান তার যা কর্তব্য তাই করেছে। পুলিশ একবার জিজ্ঞেস করেই বিশ্বাস করেছে সুদানীকে, আর ধরে নিয়ে গিয়েছে গোরাতে। সবাই জানে, সুদানীরা বড় শাস্ত স্বভাব, তারা মারপিটের ধার ধারে না।'

যাক, সব বোঝা গেল। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করবো; একা একা কারো সাহায্য না নিয়ে পল্টনের গোরাতে ঠ্যাঙাতে পারে সুদানীই। পাঠান পারে কিনা জানিনে। পারলে পারতেও পারে, কিন্তু তার বাহ আজানুলব্বিত নয় বলে সেও নিশ্চয় দূচার ঘা খাবে।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় অতি দৈবাৎ। তা-ও দু-এক ইঞ্চির বেশী নয়। তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল-কাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে। শুনলাম, এখানকার বায়স্কোপও বেশীর ভাগ হয় খোলামেলাতে।

বাঙলাদেশে আমরাও চায়ের দোকানে বসে গালগল্প করে সময় কাটাই। কেউ কেউ হয়তো রোজ একই দোকানে গিয়ে ঘন্টা দুয়েক কাটায়, কিন্তু কাফেতে বসে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটানোর রেওয়াজ আরম্ভ হয় ফ্রান্সিয়ার থেকে। কাবুলে দেখবে চার বন্ধু চলেছেন বরফ ভেঙ্গে চা-খানায় গিয়ে গল্পগোব করবেন বলে—যেন বাড়িতে বসে ও-কর্মটি করা যায় না। ওদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে 'বাড়িতে মুরশ্বীরা রয়েছেন কখন এসে কাকে ধমক লাগান তার ঠিক নেই। কিংবা হয়তো বলবেন, 'দেখ বাছা, ফিরোজ বখৎ, যাও দিকিনি মামার বাড়িতে—(আড়াই মাইলের ধাক্কা) সেখানে গিয়ে মামাকে বলো আমার নাকের ফুসকুড়িটা একটু সেরেছে, তিনি যেন চিন্তা না করেন। আর দেখো আসবার সময় হোপানীকে একটু শুধিয়ে এসো—(সে আরো দেড়মাইলের চক্কর)—আমার নীল জোম্বাটা',—ইত্যাদি।

'এক সব চেয়ে বড় কারণ, বাড়িতে মা-জ্যাঠাই মা ওরকম জালা জালা চা

দিতে রাজী হন না। ওনারা যে কল্পস তা নয়। আমি যদি এখুনি বলি, 'জ্যাঠাইমা, আমার বন্ধুরা এসেছে, ওরা বলেছে, পিসিমার বিয়ের দিনে আপনি যে দুধা-মুসল্লম করেছিলেন তারা সেইটে খাবে। কিন্তু ওদের বায়নাঝা দুধার ভিতর যেন কোফতা পোলাও আর মুগী থাকে, মুগীর ভিতর যেন পোলাও আর আভা থাকে এবং আভার ভিতর যেন পোনা মাছের পুর থাকে,—জ্যাঠাইমা তন্দভেই লেগে যাবেন ঐ বিরাট রান্না করতে। তাতে দশ-বিশ টাকা যা লাগে লাগুক।

'অথচ আমাদের চায়ের খরচা এক সন্ধ্যায় কতটুকুন? দু আনা চার আনা, মেরে কেটে আট আনা। উই, সেটি হচ্ছে না। ঘন ঘন চা খেলে নাকি ক্ষিদে মরে যায়, আহারের রুচি একদম লোপ পেয়ে যায়।'

'তাই, ভাই চায়ের দোকানই প্রশস্ততর। সেখানে একবার ঢুকতে পারলে বাবা-চাচার তক্তিত্যার ভয় নেই, মামা-বাড়িতে গিয়ে বাবার নাকের ফুসকুড়িটার লেটেস্ট বুশেটিন ঝাড়তে হয় না, জালা জালা চা পাওয়া যায়, অন্য দু-চারজন ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে মোলাকাৎও হয়, তাস-দাবা যা খুশী খেলাও যায়—সেখানে যাব না তো, যাব কোথায়?'

প্রথম বারেই প্রথম কাবুলী ভদ্রসন্তান যে আমাকে এই সব কারণ এক নিশ্বাসে বুঝিয়ে বলেছিল তা নয়, একাধিক লোককে ভিজ্জেন্স করে ক্রমে ক্রমে চায়ের দোকানে যাবার যাবতীয় কারণ আমি জ্ঞানতে পেরেছিলুম।

আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, ঐরা সত্য কথাই বলেছিলেন, এবং ঐরা যে ঘর ছেড়ে চায়ের দোকানে যান তাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, বাঙালীদের বেলাও তো এই সব আপত্তি-ওজুহাত টেকে। আমাদের মা-পিসিরাও চান না আমরা যেন বড্ড বেশী চা গিলি, বাবা-কাকাও ফাই-ফরমাসেস দেওয়াতে অতিশয় তৎপর; তবে আমরা চায়ের দোকানকে বাড়ির ডইংস্কম করে তুলিনে কেন?

এর সদুত্তর আমি এযাবৎ পাইনি। তা সে যাই হোক, এটা বেশ লক্ষ্য করলুম, রাত বারোটা একটা অবধি কাফেতে বসে সময় কাটানোতে কাইরোবাসী সবচেয়ে বড় ওস্তাদ; বন্ধুর বাড়িতে জমানো আভা দশটা এগারটার ভিতর ভেঙে যায়, কারণ বাড়িসুদ্ধ লোক তাড়া লাগায় ঝাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ার জন্য। এখানে সে ভয় নেই। উঠি-উঠি করে কেউই ওঠে না। বাড়ির লোকেরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তারা আর একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শুনেছি, এখানাকার কোন কোন কাফে খোলে রাত বারোটায়।

মোটর গাড়ি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে বলে ভালো করে সব-কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু এইবারে চোখের সামনে ভেসে উঠল অতি রমণীয় এক দৃশ্য! নাইল, নীল নদ।

আমি পূর্ব বাঙলার ছেলে। যা তা নদী আমাকে বোকা বানাতো পারেনা। আমি যে গাঙে সাঁতার কাটতে শিখেছি সেই ছোট্ট মনু নদ থেকে আরম্ভ করে আমি বিস্তর মেঘনা-পদ্মা, গঙ্গা-যমুনা এবং পরবর্তী যুগে গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী

তান্ত্রী-নর্মদা-সিন্ধু, ইয়োরোপে রাইন-ডানয্যাব-মোজেল-রোন দেখেছি। নদী দেখলে আর পাঁচ জন বাঙলার মতো আমিও গামচা খুঁজতে আরম্ভ করি—ঐ নদীতে কটা লোক গত সাত শ' বছরে ডুবে মরেছিল তার স্টাটিস্টিকসের সন্ধান না নিয়ে—একটা ভিত্তি কি কৌশলে চুরি করা যায় তার সন্ধানে মাথায় গামছা বেঁধে নি, পাটনীকে কি প্রকারে ফাঁকি দিয়ে খেয়া নৌকো থেকে নামতে হয় সেটা এক মুহূর্তেই আবিষ্কার করে ফেলি।

এই যে পৃথিবীর সব চেয়ে মধুর ভাটিয়ালী গীত। সৃষ্টিকর্তা যদি তার পূর্ব-বাঙলার লীলাঙ্গনে শত শত নদীর আলপনা না আঁকতেন তবে কি কখনো ভাটিয়ালী গানের সৃষ্টি হত? আর এ কথাও ভাবি; তিনি রয়েছেন মোহনিয়া প্রবাহিনী আর আমরা তাঁর সঙ্গে পান্না দিয়ে রচিছি ভাটিয়ালী। অবশ্য তাঁরই কাছ থেকে ধার করে। আমরা যখন ও-ও-ও-বলে ভাটিয়ালীর লগ্না সুর ধরি, মাঝে মাঝে কাঁপন জাগাই তখন কি স্পষ্ট শুনেতে পাও না, দেখতে পাও না, 'ও-র' লগ্না টানে যেন নদী শব্দ হয়ে এগিয়ে চলেছে, যখন কাঁপন লাগাই তখন মনে হয় না নদী যেন হঠাৎ থমকে গিয়ে দাঁড়ের সৃষ্টি করেছে?

প্যারিস-ভিয়েনার রসিকজনের সন্মুখে আমি আমার হাজারোটা নদী কাঁধে বয়ে নিয়ে হাজির করতে পারবো না, কিন্তু ভাটিয়ালীর একখানা উত্তম রেকর্ড শুনিতে পারি।

আমি বে-আক্কেল তাই একবার করেছিলুম। তার কি জরিমানা দিয়েছিলুম শোনো।

ভিয়েনাতে পাশের ঘরে থাকত এক রাশান। সে এসেছিল সেখানে কন্টিনেন্টাল সঙ্গীত শিখতে। ভিয়েনা শহর বেটোফেন মোৎসার্টের কর্মভূমি—আমাদের যে রকম তানসেন, ত্যাগরাজ, বাঙালীর যে রকম রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম।

ভিয়েনা ডানয্যাব নদীর পারে। 'বু ডানয্যাব' তোমাদের কেউ কেউ হয়তো শুনেছ।

একদিন সেই রাশান বললে, 'ডানয্যাব ফানয্যাব সব আজো-বাজো নদী। এ সব নদী থেকে আর কি গান বেরিয়েছে যে পান্না দেবে, আমরা রশোর ভলগা নদী থেকে যে ভলগার মাঝির গান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে? তুমি 'গড'-'ফড' কি সব মানো না? আমি মানি নে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতিকে। তারই অন্যতম মধুর প্রকাশ নদীতে। সেই নদীকে আমরা মাধুর্যে হার মানাই ভলগা মাঝির গান দিয়ে।' "

বাড়ি ফেরা মাএই সে ভলগা-মাঝির রেকর্ড শোনালে। আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'চমৎকার!'

ও। রবীন্দ্রনাথও এই 'দম্ব' করেছেন তাঁর 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল' গানে। রেকর্ডে গেয়েছেন, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রী বাসুদেব।

কিন্তু ততক্ষণে আমার বাঙাল রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। বাঙালার অবশ্য জানে, তার অর্থ কি? 'ধটি' অর্থাৎ পশ্চিম-বাঙালার লোক তাই নিয়ে হাসাহাসি করুক। আমার তাতে কোনো খেদ নেই। ওরা তো আমাদের ভাটিয়ালী ভালোবাসে, আমরা তো ওদের 'বাউল' শুনে 'বাউলে' হয়ে যাই।

আমার গরম রক্ত তখন টগবগ করে বলাছে, 'বাঙলাদেশ শত শত নদীর দেশ। রাশাতে আর ক-টা নদী আছে? তারই একটা জলগা। সে নদী হারিয়ে দেবে বাঙলাদেশের তাবৎ নদীকে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।'

ভাগ্যিস, অম্বসে উদ্দিনের 'রঙিলা' নায়ের মাঝি' আমার কাছে ছিল। সেইটে চড়িয়ে দিলুম রাশানের গ্রামোফোনে।

সে চোখ বন্ধ করে শুনে। তার পর বললে—'মা বললে তার অর্থ—'ধাঙ্গা'।

আমি বললুম, 'মানে?'

সে বললে, 'সুরটি অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং তার চেয়েও বেশী কানে ধরা পড়ে ওর অভিনবত্ব। আমি কারজোড় স্বীকার করছি, এ রকম গীত আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো, এ গীত লোক-গীত নয়। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো ভূমিতেই গ্রাম্য গীতে এতগুলো 'নোট' লাগে না। তাই বলছিলাম তুমি ধাঙ্গা দিচ্ছে।'

আমি বললুম, 'বাছা, ঐ হল ভাটিয়ালীর বৈশিষ্ট্য। ও যতখানি ওঠা-নাম্মা করে পৃথিবীর আর কোনো লোক-গীত তা করে না।'

কিন্তুতেই স্বীকার করে না ওটা লোক-গীত। তার ধারণা ওটা লোক-গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাঝখানে উপস্থিত বুলছে, আর কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই কোনো গুণী সেটাকে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বরণ করে তুলে নেবেন।

তারপর একদিন সে স্বীকার করলে। বি. বি. সি-র কল্যাণে। বি. বি. সি পৃথিবীর লোক-গীত শোনাতে শোনাতে ভাটিয়ালী শুনিতে বললে এটা পূর্ব বাংলার লোক-গীত।

আমি লড়াই জিতলুম কিন্তু তখন থেকেই শুরু হল আমার জরিমানা। আশ্চর্য লাগছে না, যে জিতলে সে দেবে জরিমানা? হয়, প্রায়ই হয়। মার্কিনিউজের জার্মানি জয় করে বহু বৎসর ধরে সেখানে ঢালছে এবং এখনো ঢালছে বিস্তার টাকা। সে কথা থাক, জরিমানাটা কি ভাবে দিতে হল বুঝিয়ে বলি।

এরপর যখনই সে আমাকে সাজা দিতে চাইত তখনই তার বেয়ালাতে বাজাতে আরম্ভ করত ভাটিয়ালীর সুর।

বোঝো অবস্থাটা! বিদেশে বিভূঁইয়ে একেই দেশের জন্য মন আঁকু পাকু করে তার উপর ভাটিয়ালীর করুণ টান।

রবীন্দ্রনাথের শ্রীকণ্ঠ বাবুর মতো আমি কাতর রোদনে তাকে বেয়ালা বদ্ব করতে অনুনয়-বিনয় করতুম।

কিন্তু আজও বলি, লোকটা যা বেয়ালাতে ভাটিয়ালী চড়াতে পারতো তার তুলনা হয় না।

কত দেশ ঘুরলুম, কত লোক দেখলুম, কত অজানা জনের প্রীতি পেলাম, কত জানা জনের দুর্ব্যবহার, হিটলারের মতো বিরাট পুরুষের উত্থান-পতন দেখলুম, সে সব বড় বড় জিনিস প্রায় ভুলে গিয়েছি, কিন্তু এই সব ছোটখাটো জিনিস কিছুতেই ভুলতে পারি নে। মনে হয় যেন আজ সকালের ঘটনা।

চাঁদের আলোতে দেখছি, নীলের উপর দিয়ে চলছে মাঝারি ধরনের খোলা মহাজনী নৌকা—হাওয়াতে কাত হয়ে তেতোণা পাল পেটুক ছেলের মতো পেট ফুলিয়ে দিয়ে। হাওয়া বইছে সামান্যই, কিন্তু এই পেটুক পাল এর ওর সবার হাওয়াই খাবার যেন কেড়ে নিয়ে পেটটাকে ঢাকের মতো ফুলিয়ে তুলেছে। ভয় হয়, আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই, হয় পারটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে, নয় নৌকেটা পেছনের খাক্সা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অতলে তলিয়ে যাবে।

এই নীলের জল দিয়ে এ দেশের চাষ হয়। এই নীল তার বৃকে ধরে সে চাষের ফসল মিশরের সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেন। তাই এ দেশের কবি গেয়েছেন,

ওগো নীলনন্দ প্রাবিতা ধরণী আমি ভালোবাসি তোরে,

ঐ ভালোবাসা ধর্ম আমার কর্ম আমার ওরে।

১৮

পিরামিড! পিরামিড!! পিরামিড!!!

কোনো প্রকাশের আশ্চর্য প্রকাশ করতে হলে আমরা তিনটে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন—!!!—দিই। তাই কি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড? কিংবা উল্টোটা? তিনটে পিরামিড ছিল বলে আমরা তিনবার আশ্চর্য হই?

এই পিরামিডগুলো সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে যা গাদা-গাদা বই লেখা হয়ে গিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা আস্ত জলে-ডাঙায় লিখতে হয়। কারণ এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ—যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করেছে, দেয়ালে-খোদাই এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে, জান তো, পিরামিডের ঠিক মাঝখানে একটা কুটুরিতে বিস্তর ধনদৌলত জড়ো করা আছে—তারই পথ অনুসন্ধান করেছে পাকা সাড়ে ছ হাজার বছর ধরে। ইরানী, গ্রীক, রোমান, আরব, তুর্কী, ফরাসী, ইংরেজ পর পর সবাই এদেশ জয় করার পর প্রথমেই চেষ্টা করেছে পিরামিডের হাজার হাজার মন পাথর ভেঙ্গে মাঝখানের কুটুরিতে ঢুকে তার ধনদৌলত লুট করার। এবং আশ্চর্য, যিনি শেষ পর্যন্ত ঢুকে পারলেন তিনি ধন লুটের মতলবে ঢোকেন নি। তিনি ঢুকেছিলেন নিছক

ঐতিহাসিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য। ফারাওয়ের রাজমিস্ত্রীরা কুটুরি বানানো শেষ করার পরে বেরোবার সময় এমন-ই মস্ত পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের দেয়ালে পাশিশ পলস্তরা লাগিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর মানুষের সাড়ে ছ' হাজার বছর লাগালো ভিতরে যাবার রাস্তা বের করতে।

মিশরের ভিতরে বাইরে আরও পিরামিড আছে কিন্তু গিজের অঞ্চলের যে তিনটে পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে সেগুলোই ভুবন-বিখ্যাত, পৃথিবীর সস্তাচর্যের অন্যতম।

রাজা	নির্মাণের সময়	ভূমিতে দৈর্ঘ্য	উচ্চতা
খুফু	৪৭০০ খ্রীঃ পূঃ	৭৫৫ ফুট	৪৮১ ফুট
খাফ্রা	৪৬০০ .. ..	৭০৬ ..	৪৭১ ..
মেনকাওরা	৪৫৫০ .. ..	৬৪৬ ..	২১০ ..

প্রায় পঁচশো ফুট উঁচু বললে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না। এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এটা ঠিক কতখানি উঁচু। চ্যাপ্টা আকারে একটা বিরাট জিনিস হাতে আস্তে স্কীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হত তবে স্পষ্ট বোঝা যেতো পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু।

বোঝা যায় দূরে চলে গেলে। গিজের এক কাইরো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরও ইঠাৎ চোখে পড়ে তিনটে পিরামিড সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর পিরামিড ছেড়ে যদি সোজা মরুমূর্মির ভিতর দিয়ে যাও তবে মনে হবে সাহারার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার পরও বুঝি পিরামিড দেখা যাবে।

তাই বোঝা যায় এ বস্তু তৈরী করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। 'টুকরো বলতে একটু কমিয়ে বল' হল কারণ এর চার পাঁচ টুকরো একত্র করলে একখানা ছোটখাটো এঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পারে ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এই পাথর নিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বায় ছ'শ পঞ্চাশ মাইল হবে। অর্থাৎ সে দেয়াল কলকাতা থেকে দার্জিলিং গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে।

সব চেয়ে বড় পিরামিডটা নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল।

ভেবে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সে সমাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে এক লক্ষ লোককে বিশ বছর খাওয়াতে পরাতে পেরেছিলেন। অন্য খরচের কথা বাদ দাও, এই এক লক্ষ লোকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সেটা পড়ে তোলা এবং তাকে বিশ বছর ধরে চালু রাখা তারাই করতে পারে যারা সভ্যতার খুব একটা উঁচু স্তরে উঠে গিয়েছে।

এইবার আমরা পিরামিড নির্মাণের কারণের কাছে পৌঁছে গিয়েছি।

প্রথম কারণ সকলেরই জানা। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাঁদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায়, কিংবা কোনো প্রকারের অঘাতে ক্ষত হয় তবে

তারা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহকে 'মমি' বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হত যে, তার ভিতরে ঢুকে কেউ যেন 'মমি'কে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে। কিন্তু হায় তাদের এ-বাসনা পূর্ণ হয় নি। পূর্বেরি বলেছি, হাজার হাজার বছর চেষ্টা করে দুই (অর্থাৎ ডাকার) এবং শিষ্টেরা (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা) শেষ পর্যন্ত তাদের গোপন কবরে ঢুকতে পেরেছেন। তাই করে অবশ্য গৌণতঃ কোনো কোনো ফারাওয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে—পণ্ডিতেরা তাঁদের মমি সম্বন্ধে যাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে তাঁরা অক্ষত দেহে মহাপ্রলয়ের দিন গুণছেন, যেদিন তাঁরা নব দেহ নব যৌবন ফিরে পেয়ে অমৃতলোকে অনন্ত জীবন আরম্ভ করবেন।

কিন্তু যদি ইতিমধ্যে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়? ফলে শুটকিয়ক অ্যাটম বম পড়ে? তবে?

আমার মনে ভরসা এঁরা যখন চোর-ডাকু ধনিক পণ্ডিতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এত হাজার বৎসর অক্ষত দেহে আছেন তখন মহাপ্রলয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন-ই যাবেন। অ্যাটম বম পড়ার উপক্রম হলে আমি বরঞ্চ তারই একটার গা ঘেঁষে গিয়ে বসবো। মমিটা রক্ষা কবচের মতো হয়ে তার দেহকে তো বাঁচাবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাঁচিয়ে দেবে। চাই কি, গোটা শহরটাই হয়তো বেঁচে যাবে।

পিরামিড নির্মাণের দ্বিতীয় কারণ—এই কারণের উল্লেখ করেই আমি এ অনুচ্ছেদ আরম্ভ করেছি—

ফারাওরা বলতে চেয়েছিলেন সভ্যতার যে স্তরে আমরা এসে পৌঁছেছি আমরা যে প্রভাবশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি, সেগুলো যেন এই পিরামিডের মতো অজর অমর এবং বিশেষ করে অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। 'পরিবর্তন যেন না হয়', 'যা-আছে তাই থাকবে', এই ছিল পিরামিড গড়ার দ্বিতীয় কারণ। পিরামিড গড়ার জগদ্বল পাথর হয়ে—অতি শব্দার্থে জগদ্বল পাথরই বটে—যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রাজবংশ, ধর্মনীতি সবকিছু, অপরিবর্তনীয় করে চেপে ধরে রাখবে।

তাই পিরামিড দেখে মানুষের মনে জাগে ভয়। আজ যদি সেই ফারাওরা বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর প্রতি জাগতো ভীতি। এই পিরামিড যে তৈরী করতে পেরেছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার কল্পনাও তো মানুষ করতে পারে না।

তাজমহলের গীতিরস কঠিন মানুষের পাশাপাশি হৃদয়কেও গলিয়ে দেয়, কুতুবমিনারের ঋজু দেহ উল্লুগশির দুর্বলজনকে সবল হয়ে দাঁড়াতে শেখায়—এই দুই রস কাব্যের, সঙ্গীতের প্রাণ। তাজমহল নিয়ে তাজমহলের মতো কবিতা রচনা করা যায় কিন্তু পিরামিড নিয়ে কবিতা হয়েছে বলে শুনি নি। বরঞ্চ পিরামিডের দোহাই দিয়ে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের অনুকরণে আজ এক নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং অর্ডিন্যান্স তৈরী করা যায়।

কিন্তু হায়, ফারাওরা 'অপরিবর্তনের' যে অর্ডিন্যান্স জারী করে বিরাট

বিরাট পিরামিড গড়েছিলেন, সেটা টিকলো না। ফারাও বংশ ধ্বংস হল, দূর ইরানের রাজারা মিশর লুণ্ঠন করে দিল, তারপর গ্রীক, রোমান এবং শেষটায় সারা মিশরের লোক ইসলাম গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নতুন পথে চললো। মুসলমানরা দেহ এবং আত্মার পার্থক্য চেনে। অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য দেহটাকে যে মমি করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, সে কথা তারা বোঝে।

কিন্তু ফারাওদের দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। প্রায় সব দেশেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে বলেছে, 'এই ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি আর এগিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। যা সক্ষম করেছি তাই বেষ্ট থাকুক, সেইটাই অপরিবর্তনীয় হয়ে থাক'। ফলে হয়েছে পতন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিবয় নিয়ে 'তাজমহলের' মতো কবিতা লিখেছেন তখন আমার আর বাক্যব্যয় কি প্রয়োজন?

## ১১

চাঁদের আলোতে বিশ্বজন তাজমহল দেখবার জন্য জড় হয়।

পিরামিডের বেলাও তাই।

চতুর্দিকে লোকজন গিসগিস করছে। এদেশের মেলাতেও বোধ করি এত ভিড় হয় না।

অবশ্য তার কারণও আছে। নিত্যন্ত শীতকাল ছাড়া গরমের দেশে দিনের বেলা কোনো জিনিস অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে দেখা যায় না। বিশেষ করে যেখানে কোনো সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখবার বাল্যই নেই সেখানে তো আরো ভালো। তাজের মিহি কাজ চাঁদের আলোতে চোখে পড়ে না, তবু সবসুদ্ধ মিলিয়ে তার যে অপরূপ সামঞ্জস্য চাঁদের আলোতে ধরা দেয় দিনের কড়া আলোতে সেটা দর্শককে ফাঁকি দেয় বলে মানুষ চাঁদের আলোতে তাজ দেখে। পিরামিডে সে রকম কোনো নৈপুণ্য নেই, তদুপরি পিরামিডের চতুর্দিকে মরুভূমি বলে সেখানে দিনের বেলাকার গরম পীড়াদায়ক, কাজেই নিত্যন্ত শীতকাল ছাড়া দিনের বেলা কম লোকই পিরামিড দেখতে যায়।

পঞ্চাশতের শীতের দেশে ব্যবস্থা অন্যরকম। আমি ফটফটে চাঁদের আলোতে কলোন গিজার পাশ দিয়ে শীতের রাতে হি-হি করে বহবার বাড়ি ফিরেছি। কাক-কোকিল দেখতে পাই নি।

পল পার্সি আর আমাদের দলের আরো কয়েকজন পিরামিডের মাঝখানকার কবর-গৃহ দেখতে গেছেন। আমি যাই নি।

আমি বসে বসে শুনেছি জাত-বেজাতের কিচিরমিচির, স্যান্ডউইচ খেলার সময় কাগছের মড়মড়, সোডা-লেমনেড খেলার ফটফট। ইয়োয়োরপীয়েরা বাবার ব্যবস্থা সঙ্গে না নিয়ে তিন পা চলতে পারে না। পিরামিড হোক আর নিম-

তলাই হোক, মোকামে পৌঁছনো মাত্রই বলবে, 'টম, বাস্কেটটা এই দিকে দাও তো। ডিক, তুমি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালো' আর স্ট্রীর দিকে তাকিয়ে 'ভার্জি, আপেলগুলো ভুলে যাওনি তো?' ইতিমধ্যে হারি হয়তো গ্রামোফোনের জাতি চালিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য যদি দলে মেয়েরা ভারী হন তবে কোনো-কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। 'লাভলি', 'গ্র্যান্ড', 'সবলাইম' ইত্যাদি শব্দে তখন যে ঘাঁট তৈরী হয় তার কোনটা কি, ঠিক ঠাহর করা যায় না।

কোনো কোনো টুরিস্ট আমাকে বলেছেন, নায়াগার গভীর জল নির্ঘোষ শুনতে হলে নাকি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেতে নেই। যে ধনি তাদের ভিতর গুঁঠে তাতে নাকি নায়াগার-থাক, মেয়েরা আমার উপর এমনিতেই চটে আছেন। কিন্তু আমার উপর চটে আর লাভ কি? ওয়াদের খাস-পেয়ারা কবি রবীন্দ্রকুরই এ-বাবদে কি বলেছেন—

'ছেলেরা ধরিল পাঠ, বুড়ারা তামুক,

এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ'।

পল পার্সি ফিরে এসেছে। আমি শুধালুম, 'কি দেখলে, বাছারা? তারপর নোট বুক খুলে বললুম, 'গুছিয়ে বলো সবকিছু টুকে নেব, আমি তো বে-আক্কেলের মতো এই এখানে বসে বসে সময় কাটালাম।'

পার্সি করুণ কণ্ঠে বললে, 'আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না স্যার। দেখছি কিছু পোড়া। মশালের আলোতে হাতের তেলো চোখে পড়ে না। তারই জোরে বিস্তার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা চৌকো ঘরে শেষটায় পৌঁছলুম। বেবাক ভৌ ভৌ। এক কোণে একখানা ডাঙা ঝাটা পর্যন্ত নেই। গাইড বললে, 'বাস ফিরে চলুন।' আপনি তখনই বারণ করলেন না কেন?

আমি বললুম, 'বারণ করলে কি শুনতে? বাকী জীবন মনটা খুঁ খুঁ করতে না, ফারাওয়ের শেষ শোওয়ার ঘর দেখা হল না? এ হল দিল্লীর লাডলু।'

শুধালে, 'সে আবার কি?'

আমি বুঝিয়ে বললুম।

পল বললে, 'গাইড বলছিল, পিরামিডের যে বিরাট বিরাট পাথর সেগুলো নাকি টেনে টেনে নদীর ওপার থেকে এখানে আনা হয়েছিল। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না—ওর যা ইংরেজী।'

আমি বললুম, 'ঠিকই বলেছে! নীলের এপারে পাথর পাওয়া যায় না। তাই ওপার থেকে পাথর কেটে ভেলয়ে করে এপারে নিয়ে আসা হত। আর সে যুগে মানুষ চাকা কি করে বানাতে হয় জানতো না বলে সেই পাথরগুলো ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত। কাঠ বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হত পিছলে নিয়ে যাবার সুবিধের জন্য। এবং শুনেছি, সে পথে নাকি ঘড়া ঘড়া তেল ঢালা হত, সেটাকে পিছলে করার জন্যে আঁচর্য্য নয়। এর ছটা পাথরে যখন একটা এঞ্জিনের আকার ধরতে পারে, এবং স্পষ্ট দেখেছি, এঞ্জিন রেল লাইন থেকে কাত হয়ে পড়ে গেলে তাকে খাড়া করার জন্যে আজকের দিনের কপিকল পর্যন্ত কি রকম হিমসিম খায়, তখন আর তেল ঘি ঢালার কথা তো আর অবিশ্বাস করা যায় না।'



তখন আলোচনা আরম্ভ হল চাকা আবিষ্কার নিয়ে। আশুন যে রকম মানুষকে সভ্যতার পথ দেখিয়ে দিল চাকাও মানুষকে ঠিক তেমনি বাকি পথটুকু অক্লেশে চলতে শেখালে। শুনছি ভারতের মেন-জো-দড়োতে প্রথম চাকা আবিষ্কার হয় এবং ক্রমে ক্রমে সেটা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা এখানে যখন পাকী চড়ি তখন বোধ হয় আদিম যুগে ফিরে যাই, যখন মানুষ চাকা আবিষ্কার করতে শেখে নি। ছজন বেয়ারা একটি মেয়েকে বইতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে যায়, ঘড়ি ঘড়ি জিরোয় আর গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায়; ও দিকে একজন রিকশাওয়া দুটো লাশকে দিবা টেনে নিয়ে যায়—সবই চাকার কল্যাণে।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'চাকা এরা আবিষ্কার করতে পারে নি সত্যি, কিন্তু হাতের নৈপুণ্যে এরা আর সবাইকে হার মানিয়েছে। এই যে হাজার হাজার টনী লক্ষ লক্ষ পাথর একটার গায়ে আরেকটা জোড়া দিয়েছে, সেখানে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের একভাগের কাজ। আজকের দিনের জহরীরা, চশমা বানানো—ওপারাও এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে কিনা সন্দেহ। আর জহরীদের কাজ তো এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি মাল নিয়ে। এরা সামলেছে লক্ষ লক্ষ ইঞ্চি।'।

আমরা শুধালুম, 'তা হলে তারা সে নৈপুণ্য কোনো সূক্ষ্ম কলা নির্মাণে কোনো সৌন্দর্য সৃষ্টিতে প্রয়োগ করল না কেন?'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'সেটা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মন্দিরগারে তাদের প্রস্তর মূর্তিতে'।

হায়, সেগুলো এখন দেখবার উপায় নেই।

পার্সি ততক্ষণে বাসু জড়ো করে বালিশ বানিয়ে তারই উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। তত্ত্বালোচনার প্রতি তার একটা বিধিদণ্ড আঙ্গুলের নিরঙ্কুশ বৈরাগ্য আছে। স্বতই ভক্তিতরে মাথা নত হয়ে আসে।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। শহরে ফেরা যাক।'।

পল অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিল। মোটরের দিকে যেতে যেতে বললে, 'আমার কিন্তু সমস্ত জিনিসটা একটা হিউজ ওয়েস্ট বলে মনে হয়।'। আমরা সবাই চুপ করে শুনলুম।

আমাদের দলের মধ্যে একটি পৌড়া মহিলা ছিলেন। তিনি বললেন, 'না, মসিয়ো পল। পিরামিডের একটা গুণ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। এর সামনে দাঁড়ালে, বয়সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাদের তরুণী বলে মনে হয়।'।

একটা কথার মতো কথা বটে।

আমি বললুম, 'শাবাশ!'

২০

মানুষের চেহারা জাগ্রত অবস্থায় এক রকম, ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য রকম। শহরের বেলাতেও তাই। জাগ্রত অবস্থায় কোনো মানুষকে বেশ চালাকচতুর বলে মনে হয়, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকেই দেখায় আন্ত হাবা গঙ্গারামের মতো।

দুপুরবেলা লালদিঘি গমগম করে রাতে সেখানে গা ছম ছম করে। আমাদের পাড়া পার্ক সার্কাসের ট্রাম ডিপো অঞ্চল দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় হোটেলগুলো যেন কোরাস গান গেয়ে ওঠে।

রসের ক্ষেত্রে আমি ছেলে বুড়োতে তফাত করি নে। আট বছরের ছেলে মহাভারত পড়ে সুখ পায়, আশী বছরের বুড়োও আনন্দ পায়। আবার আট বছরের ছেলে দিবা কীর্তন গেয়ে শুনিতে দিলে, ষাট বছরের সুরকানা পন্ডিত ধরতে পারলেন না, সেটা কীর্তন না বাউল! অর্থাৎ রসবোধের ক্ষমতা বয়সের উপর নির্ভর করে না।

কিন্তু কোনো কোনো ছোটখাটো রস বয়সের উপর নির্ভর করে। আট বছরে সিগারেট খেয়ে কোনো লাভ নেই, আঠারোতেই রাস্তায় মার্বেল খেলার রস শুকিয়ে যায়। ঠিক তেমনি রাতের শহর ছোটদের জন্য নয়। তুলনা দিয়ে বলি; সকাল আটটায় আট বছরের ছেলেকে আটখানা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাতে পারি কিন্তু রাত দশটায় দশ বছরের ছেলেকে দশ জায়গায় পাঠাতে পারি নে।

কিন্তু যে সব দুঁদে ছেলেরা—যেমন পল পার্সি—রাত দুটোর সময় জেগে আছে, তাদের নিয়ে কি করা যায়? আবুল আসফিয়া অভয় জানিয়ে বললেন, 'কাইরোতে এমন সব নাচের জায়গা আছে, সেখানে বাপ মা আপন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে যান!'

তারই একটা 'কাবারে'তে যাওয়া হল।

খেলাতো উপরে মুক্ত আকাশ। চতুর্দিকে জাপানী ফানুসে ঢাকা রঙ-বেরঙের আলোর জ্যোতি ক্ষীণ বলে উপরের দিকে খানিকক্ষণ তাকালে গম্ভীর আকাশের গায়ে চটুল তারার মিটমিটে নাচ দেখা যায়।

শ'খানেক ছোট ছোট টেবিল। এক প্রান্তে স্টেজ। ডাইনে বাঁয়ে উইন্ড নেই, পিছনে শুধু, হবহ শুক্কির এক পাটির মতো কিংবা বলতে পারো, সাপের ফণার মতো উঁচু হয়ে ডগার কাছে নিচের থেকে বেকে আছে স্টেজের বিরাট ব্যাকগ্রাউন্ড। শক্তিতে আবার ঢেউ খেলানো—এ রকম ছোট্ট সাইজের কিনুক সমুদ্র পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া যায়—দেখতে ভারি চমৎকার। ব্যাকগ্রাউন্ডের পিছনে এরই আড়ালে গ্রীনরুম নাকি, না মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে?

হঠাৎ সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। ভাবছি ব্যাপারটা কি। পল পার্সিকে কানে কানে বললুম 'মনিব্যাগ চেপে ধরো!'। 'বলা তো যায় না বিদেশ—কিছুই জায়গা।'।

নাঃ আলো জ্বলতে দেখি, শক্তির সামনে এক স্কিনকস। পিরামিডের পাশে আমরা এই স্কিনকসের পাথরের মূর্তি দেখেছি—অবশ্য এর চাইতে পাঁচশো গুণে বড়। স্কিনকস মিশরের সম্রাট ফারাওয়ের প্রতিমূর্তি। মুখটা রাজারই মতো শুধু শক্তি আর প্রতাপ বোঝানোর জন্য শরীরটা সিংহের।

পিছনে থেকে বেরিয়ে এল ছটি মেয়ে। গলা থেকে পা অবদি ধবধবে সাদা শেমিজের মতো লম্বা জামা পরা। রাস্তায় মিশরী মেয়েদের এ রকম জামা পরতে দেখেছি। তবে অন্য রঙের।



আন্তে আন্তে তারা স্কিনকসের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করল। বড় মৃদু পদক্ষেপ। পায়রা যে রকম নিঃশব্দ পদসঙ্কারণে হাঁটে। চাঁদ যে রকম আকাশের উপর দিয়ে তারার ফুলকে না মাড়িয়ে আকাশের এপার-ওপার হয়।

পায়ে ঘুরে নেই, হাতে কীকন নেই। শুধু থেকে থেকে সময়ের একটু আগে তেহাইয়ের সময় থেকে বীশী, খঞ্জনী আর ঢোলের সামান্য একটুখানি সঙ্গীত। বড় করুণ, অতি বিবাদে ভরা। নীলনদের এপার থেকে মা যেন ওপারের ছেলেকে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার জন্য ডাকছে। এ ডাক আমি জীবনে বহবার শুনেছি। যে মা-ই ডাকুক না কেন, আমি যেন সে ডাকে আমার মায়ের গলা শুনতে পাই।

সে ডাক বদলে গেল। এবারে শুনতে পাচ্ছি অন্য স্বর। এ যেন মা ছেলেকে ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করছে। এ গলায় গোড়ার দিকে ছিল অনুনয়-বিনয়। তার পর আরম্ভ হল আশা-উদ্দীপনার বাণী। সঙ্গীত জোরালো হয়ে আসছে। পদক্ষেপ দ্রুততর হয়েছে। ছটি নয় এখন মনে হচ্ছে যেন বাটটি মেয়ে দ্রুত হতে দ্রুততর গায়ে নৃত্যাদ্বন্দ্ব অপরূপ আলিঙ্গনে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। আর পদক্ষেপের কণামাত্র স্থান নেই।

স্বপ্নে অজানা লিপি, অচেনা বাণী মানুষ যেমন হঠাৎ কোন এক ইন্দ্রজালের প্রভাবে বুকে ফেলে, আমি ঠিক তেমনি হঠাৎ বুকে গেলুম নাচের অর্থটি কি। এ শুধু অর্থবিহীন পদক্ষেপ নয় বাজনাহীন হস্ত বিন্যাস নয়। নর্তকীরা নব মিশরের প্রতীক। এরা প্রাচীন মিশরের প্রতীক স্কিনকসকে তার যুগ-যুগান্তব্যাপী নিদা থেকে জাগরিত করতে চাইছে। সে তার লুপ্ত গৌরব নিয়ে সৃষ্টিজাল ভিন্নভিন্ন করে আবার মিশরে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, বিদেশী স্বৈরতন্ত্রের কুহেলিকা উদ্ঘাটন করে সেই প্রাচীন সবিতার নবীন মূর্তি দুলালোক ডুলালোক উদ্ভাসিত করুক।

তবে কি আমারই মনের ভুল? দেবি স্কিনকস মূর্তির মুখে যেন হাসি ফুটে উঠেছে। এ কি জাদুকরদের জানুমতী, না সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক আশীর্বাদ?

আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

নিদ্রিতের চোখে যে রকম পড়ে, আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়ল পশ্চিমাকাশ থেকে চন্দ্রাস্তের রক্তছটা আর পূর্বাকাশ থেকে নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস।

জয় মিশরভূমির জয়।

ইংরেজিতে কি যেন একটা প্রবাদ আছে,—

Early to bed and early to rise.

তার পর কি যেন সব হয়? হ্যাঁ বাঙলাটা মনে পড়েছে,—

সকাল সকাল শুভে যাওয়া সকাল বেলা ওঠা,

স্বাস্থ্য পাবে বিদ্যে হবে, টাকাও হয় মোটা।

গ্রামের তুলনায় শহরে টাকা বেশী, রাস্তায় রাস্তায় বিদ্যার ভান্ডার ইকুল-কলেজ আর শহরবাসীকে অজর অমর করে রাখবার জন্য কত ডাক্তার-কবিরাজ হেকিম না খেয়ে মরছে তার হিসেব রাখে কে? তাই বোধ হয় শহরের লোক সকাল সকাল শুভে যাওয়ার আর সকাল বেলা ওঠার প্রয়োজন বোধ করে না। গ্রামের লোক তাই এখনো ভোরবেলা ওঠে। কাইরো শহর তাই এখনো ঘুমচ্ছে—অবশ্য নাক ডাকিয়ে নয়।

আবুল আসফিয়া বললেন 'তা ঠিক, কিন্তু মুসলমানদের প্রথম নামাজ পড়তে হয় কাক-কোকিল ডাকার পথলী। এদেশে তাদের বড় বড় মসজিদ মাদ্রাসা আজহর পাড়ায়। সেখানেই যাওয়া যাক। তারা নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে।'

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মসজিদের নামাজীদের দেখবার জন্য এ সুদূর কাইরো শহরে আসা কেন? আপন কলকাতায় জাকারিয়া স্ট্রীটে গেলেই হয়।

উহ, সেইটেই নাকি কাইরোর প্রবীণ অঞ্চল। অবশ্য পিরামিডের তুলনায় অতিশয় নবীন—বয়স মাত্র এক হাজার বৎসর। কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক। প্রাচ্যের রোমান্টিক নগরী কাইরো বলতে জগজ্ঞানের মনে আরবীস্থানের যে রঙীন তসবির ফুটে ওঠে সে বস্তু নাকি এখনো ঐ অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

টাম কিছু তখনই চলতে আরম্ভ করেছে। কলকাতায় টামের তুলনায় অতিশয় লজ্জবুদু এবং ছুটির দিনে ইকুল-কলেজের মতো ফাঁকা।

পয়সা টাম দেখা মাত্রই আবুল আসফিয়া তড়িঘড়ি ট্যাক্সিগুলাদের পাওনা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছেন। পয়সা বাঁচাবার এ ফিকির সবাই জানে কিন্তু বিদেশে বিতুইয়ে কে জানে কোন টাম কোথায় যায়? আপন কলকাতাতেই যখন টামের গুলেটে নিতি নিতি কালাঁঘাট যেতে গিয়ে পৌছে যাই মৌলা আশী, কিংবা বলতে পারো মর মর অবস্থায় মেডিকেল কলেজ না পৌছে টাম ভিড়ল নিমতলায়। 'বল হরি, হরি বল!'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'আগ্না আছেন, ভাবনা কি'

'তব সাখী হয়ে

দক্ষ মরুতে

পথে ভুলে তবু মরি

তোমাতে তাজিয়া

মসজিদে গিয়া

কি হবে মজ্ব সুরি!'

তবু খুব ভরসা পেলুম না। হরিই বলো আর আগ্নাই বলো, তাঁরা সব ক-জন। এই কটা বাড়িভুলের জন্য অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এই অবেলায় ঠিক টাম ঠিক সময়ে ঠিক জয়গায় পাঠাবার তদারকিতে বসে আছেন—এ ভরসা করতে হলে যতখানি বিশ্বাসী হতে হয় আমি ঠিক ততখানি নই। তা হই আর না হই, আর পাঁচ জনের সঙ্গে সঙ্গে টামেই উঠতে হল।

রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্বত্র যা হয়—খোলা-মেলায় নতুন শহর থেকে নোংরা ঘিঞ্জি পুরানো শহরে ঢোকবার সময়।

রাস্তার দুদিকে দোকানপাট এখনো বন্ধ। দু' একটা কফির দোকান খুলি খুলি করছে। ফুটপাথের উপর লোহার চেয়ারের উপর পদ্মাসনে বসে দুচারটি সুদানী দারোয়ান তসবী টপকাচ্ছে, খবরে কাগজগুলার দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড়, চাকর-বাকর হনহন করে চলছে বড় সায়েবদের বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছে বলে।

তরল অঙ্কুর সরল আলোর জন্য ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে। কালো চুলের মাঝখানে সাদা সিঁথি ফুটে উঠেছে। তার ওপর দেখা যাচ্ছে লাল সিঁদুরের পৌছ। আকাশ বাতাসের এই নীলা খেলাতে সব কিছু যে পট্টাপট্ট দেখা গেল তা নয়, কিন্তু টামের জানালার উপর মাথা রেখে আধো ঘুমে আধো জাগরণে জড়ানো হয়ে সব কিছুই যেন কিছু দেখা হল। স্বপ্নে ঘুমে জাগরণে মেশানো অতিজ্ঞতা ভাষাতে প্রকাশ করা কঠিন। ছবিতে এ জিনিস ফোটানো যায় অনেক অক্লেশে। তাই বোধ হয় চিত্রকরদের সূর্যোদয়ের ছবির সাহিত্যের সূর্যোদয়কে প্রায়ই হার মানায়।

সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল মসজিদের চূড়ো মিনার। গুলোকে। কুৎব মিনার যারা দেখেছে তারাই জানে তার সৌন্দর্য কি? মনে হয় সে যেন পৃথিবীর ধুলো মাটির প্রাণী নয়। সে যেন কোনো রাজাধিরাজের উকীল-দেশের আপমর জনসাধারণের বহু উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে ভগবানের আপন হাতের অতিথেক আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছে।

তবু কুৎবের পা মাটিতে ঠেকেছে। এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লার নামাজারে ঘর মসজিদের উপর। কিন্তু এরা জানে উপরের দিকে আল্লার কাছে যাওয়ার অর্থ কি। সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যতই উপরের দিকে যাচ্ছে ততই ভয়ে জড়সড় হয়ে সর হয়ে যাচ্ছে—ক্লাসের গান্দা-গোন্দা ছেলেও যে রকম হেড মাস্টারের সামনে শর কাটিটি হয়ে যায়। কিন্তু দুশ্লোক আর সবিতা যেন ওদের অভয় দিচ্ছেন। আকাশ যেন তাঁর আপন নীলায়রী তাদের পরিবেশ দিতে এসেছেন—পিছনের দিকটা পরা হয়ে গিয়েছে, আর সবিতা যেন অরক্ষালোকের লম্বা লম্বা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছেন। তাই দেশে ওমর খৈয়াম বললেন,

And lo! the Hunter of the Past has caught

The Sultan's turret in a noose of light, (Fitzgerald)

কান্তি ঘোষের ইংরিজী অনুবাদ সচরাচর উত্তম কিন্তু এ স্থলে আমি একটু আপত্তি জানাই। তাঁর অনুবাদে আছে,—

পূর্ব-গগনের দেব শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ তীর

পড়ল এসে রাজ-প্রাসাদের মিনার যোখা উচ্চ শির। (কান্তি ঘোষ)

আসলে কিন্তু সূর্যালোক তীরের মতো মিনারের উপর আঘাত দিতে পারে। আবার 'নূস'—ফাঁসের মতোও তাকে জড়িয়ে ধরতে পারে। তফাত বিশেষ কিছু নেই আর 'পাগলা' কবিতা কত যে উদ্ভট উপমা দেয় তার কি ইয়ত্তা আছে? তবে কিনা অনুবাদের বেলা মূল্যের হত কাছে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

১। স্বর্ণীয় কান্তি ঘোষ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আর বহু শুণীজনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এ-অধ্যায় তাঁর অনুবাদে উচ্ছ্বসিত।

প্রকৃতির গড়া নীল, আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদে ভুবন-বিখ্যাত এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পৃথিবীর বহু সমঝদার শুদ্ধমাত্র এই মসজিদগুলোকেই প্রাণভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র ভের নদী পেরিয়ে কাইরোতে আসেন। পিরামিড যারা বানিয়েছিল তাদের বংশধররাই এ সব মসজিদগুলো বানিয়েছে ভিন্ন শৈলীতে। বিশেষত—পূর্বেই বলেছি—পিরামিড তার লক্ষ লক্ষ মণ ওজন নিয়ে মাটির উপর ভারিঙ্কি চালে বসে আছে, তার রাজা যে ভাবে প্রজাদের বৃকের উপর ভগন্দল পাথরের মতো বসতেন তারই অনুকরণ করে। পরবর্তী যুগের মসজিদ যারা বানিয়েছিল তারা মুসলমান। তারা রাজার রাজা সৃষ্টিকর্তাকে দেয় সর্বোচ্চ স্থান। তাই তাদের মসজিদের মিনারগুলো উপরের দিকে ঝেয়ে চলেছে, দুশ্লোকের সন্ধানে। কিংবা বলতে পারো তারা দাঁড়িয়ে আছে, মুসলমান নামাজ পড়ার সময় যে রকম প্রতিদিন পাঁচ বার সোজা হয়ে আল্লার সামনে দাঁড়ায়। তাই পিরামিডে জীতিরস, মসজিদে গীতিরস।

পল পার্সি দেখলুম এ রশে ইকং বকিত। আমরা পুরনো কাইরোর মাঝখানে পৌছতেই টাম ছোড়ে একটা মসজিদের অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে আরম্ভ করছি; ওরা দেখি, মা-মাসীর তরীতে গিয়ে শীতের গঙ্গান্নানের সময় আমরা যা করি তাই করছে। গঙ্গা যে সুন্দর সেটা স্বীকার করছে কিন্তু তাতে নিমজ্জিত হওয়ার আনন্দ সম্বন্ধে সন্দিহান।

পার্সি একটু ঠোটকাটা। হক কথা—অর্থাৎ যেটাকে সে হক ভাবে, সেটা টক হলেও ক্যাট-ক্যাট করে বলতে পারে। পলের ভাবটা একটু আলাদা। অস্থম্য যদি পিটুলি-গোলা খেয়ে সানন্দে ভাসতে নৃত্য জোড়ে তবে পার্সি তাকে তনুহুতে বলে দেবে যে নৃধের বদলে তাকে ঘোল দিয়ে কাঁকি দেওয়া হয়েছে, আর পল ভাববে, কি হবে ওর ভুল ভাঙ্গিয়ে তার অনন্দটা নষ্ট করতে, ও যে আনন্দ পাচ্ছে তাতে তো কারো কোনো লোকসান হচ্ছে না।

পার্সি বললে, 'হঃ! যত সব! পিরামিড? হ্যাঁ বুঝি। মোক্ষম ব্যাপার। চারটিখানি কথা নয়। পার্সি ও রকম একটা বানাতে? মানলুম, এ মসজিদটা সুন্দর কিন্তু এটা বানানো আর তেমন কি?

পার্সিও মসজিদ দেখে বে এজেন্সার হয় নি। যে কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এ যুক্তিটি তারও মনঃপূত হল না। শুধালে, 'পারো তুমি বানাতে?'

'আলবৎ'।

আমি বললুম, 'সন্দেহের কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে। আজকের দিনে যে-সব কল-কজা দিয়ে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তৈরী করা যায় তাই দিয়ে পিরামিড তৈরী করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ মসজিদে যে নিপুণ মোলায়েম কারুকার্য আছে সে রকম কারবার মতো হাত আজকের দিনে আর কারো নেই। আর থাকলেই বা কি? সেটা তো হবে নকল। ভূমি যদি একটা বিরাট দীঘি বোড়ো তবে এ কথা কেউ বলবে না, এটা অনুক দীঘির নকল। যদি একটা পিরামিড বানাও তবে বলবে না এটা পিরামিডের নকল, কারণ সব পিরামিডই হুবহু একই

প্রকারের, কোনোটা বেশী বড় কোনোটা কম বড়। কিন্তু তুমি যদি 'হামলেট' খানা নকল করে মাসিক পত্রিকায় পাঠাও তবে তারা ছাপবে না, বলবে নকল। তুলনাটা মনঃপূত হল না? তবে বলি, তুমি যদি মোনাসিয়ার ছবি পর্যন্ত হবহ্ব একে ফেলো তবে সবাই বলবে, নকল, তবে ওস্তাদের হাত বটে, 'বাঃ' কেউ বলবে না 'আঃ'।

পল শুধালে 'বাঃ' আর 'আঃ'—এর মধ্যে তফাতটা কি?

আমি বললুম 'সেখানে শুদ্ধমাত্র হাতের ওস্তাদী কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা, যেমন মনে করো মাটির থেকে একশ' হাত উপরে একটা দড়ির উপর হেঁটে চলে যাওয়া, কিংবা মনে করো সিঁড়িটার মুখের ডিতর আপন মুকুটা চুকিয়ে দেওয়া, এক কথায় সার্কাসের ভাবৎ কসরত দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলি, 'বাঃ! পিরামিডের বেলাও তাই, বলি 'বাঃ'। কিন্তু অমিত্যভের উত্তম প্রতিকৃতিতে তাঁর শাস্ত-প্রশান্ত মুখাবিহীন কিংবা মাদন্যুর মুখে বিগলিত মাতুরস দেখে আমরা রসের সাগরে ডুবতে ডুবতে বলি, 'আঃ'। কী আরাম! কী সৌন্দর্য! 'বাঃ'—এর কেঁদানি যতই কঠিন, যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন তার শেষ মূল্য 'আঃ'—এর জিনিসের চেয়ে কম। এভারেটের চুড়োয় ওঠা যত কঠিনই হোক না, তার মূল্য ত্রিযাসী পথিককে এক পাত্র জল দেওয়ার চেয়ে অনেক কম। এই যে পার্সি বললে, সে পিরামিড বানানোর মতো কঠিন কর্ম করতে পারে না, সেইটাই সব কিছু যাচাই করার শেষ পরিশোধ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের খুব সম্ভব দড়ির উপরে খেঁই খেঁই করে নৃত্য করতে পারতেন না। তাই বলে ঐ কর্ম তার 'হামলেটের' চেয়ে মূল্যবান এ রায় কে দেবে? আসলে দুটো আলাদা জিনিস। তুলনা করাই ভুল। পিরামিডে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ওনোর হেকমৎ (কিল) আর মসজিদে আছে রসসৃষ্টি (আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন)।

ইতিমধ্যে দেখি একটি মিশরীয় জোম্বা পর' ছাত্র আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। চেহারা দেখে ভারতীয় বলেই মনে হল।

২২

আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স পুরো-পাকা এক হাজার বৎসর। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, বার্লিন এর চেয়ে কয়েকশ' বছরের ছোট। তবু আজ যে সব গুণীজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এরা ঐ-সব ইয়োরাপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আজহর থেকে যীরা বেরোন তাঁদের নাম তো শুনতে পাই নে। হী। মনে, পড়ল, মিশরের গাধী বলতে যাকে বোঝায় 'দ' জগল পাশা ছিলেন আজহরের ছাত্র। কিন্তু আর কারো নাম শুনতে পাই নে কেন?

আশ্চর্য! মুসলমানরা যখন স্পেন দখল করল তখন তারা সেখানে আজহরের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ল। প্যারিস যুনিভার্সিটির গোড়াপত্তন যীরা করেন

তাঁদের অনেকেই লেখাপড়া শিখেছিলেন স্পেনের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবং প্রথম দিককার পাঠ্যপুস্তকগুলো পর্যন্ত আরবী বই থেকে লাতিনে অনুবাদ করা। আজ আর আজহরের নাম কেউ করে না, করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের।

কিন্তু আশ্চর্য্য হই কেন? একদা এই ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীকরা আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল। পরবর্তী যুগে ইয়োরাপীয়রা আমাদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শিখল। লক্ষ্য করেছ বোধ হয় রোমান হরকে যখন I, II, X, XII, C, M লেখ তখন শূন্যের ব্যবহার আদপেই হয় না। এবং তারই ফলে তাদের গণিত শাস্ত্র কী অসাধারণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। আরবরা চরক সূক্তের অনুবাদ করলে, আরো কতো কী। একাদশ শতকে ভারত আক্রমণকারী মুসলমান মাহমুদের সভাপতিত্ব অলবৌরনী সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা পড়ে সে যুগের মুসলিম জগৎ অবাক হয়ে ভারতবর্ষের গুণগান করেছিল। তারও পরবর্তী যুগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারা শীকুর উপনিষদ সম্বন্ধে ফার্সী বই লাতিনে তর্জমা হয়ে যখন ইয়োরাপে বেরলো তখন সে-বই নিয়ে ইয়োরাপে কী তোলপাড়াই না হয়েছিল। সে যুগের সেরা দার্শনিক শোপেন-হাওয়ার তখন বলেছিলেন, 'এই বই আমার জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে ভরে দেবে।' ঐ সময়েই বিশ্বকবি গোট্টে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে ঘন ঘন 'সাধু সাধু' বলেছিলেন।

এখনো ভারতবর্ষের, আজহরের পুরনো সম্পদের সম্মান ইয়োরাপীয়রা করে কিছু আজকের দিনে যীরা শুধু সংস্কৃত কিংবা মিশরে আরবীর চর্চা নিয়ে পড়ে থাকেন তাঁদের নাম কেউ করে না। তাঁরা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না কেন যা পড়ে বিজ্ঞান বিমোহিত হয়ে পুনরায় 'সাধু সাধু' রবে হাজার তোলে?

হায় এঁদের সৃজনী শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। কেন ফুরলো? তার একমাত্র কারণ, এক বিশেষ যুগে এসে এরা ভাবলেন, এঁদের সব কিছু করা হয়ে গিয়েছে, নতুন আর কিছু করার নেই, পুরনো পুঁজি ভাঙিয়ে খেলেই চলবে।

এক তার চেয়েও মারাত্মক কথা,—এরা অন্যের কাছ থেকে আর কিছু শিখতে চান না। এঁদের দৃষ্ট দেখে তাই স্তম্ভিত হতে হয়।

আজহরের ছেলেটিকে ভিজ্জেস করলুম, 'তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স কেমেস্ট্রি বটনি পড়ানো হয়?'

সে শুধালে 'এ সব কি?'

অনেক কষ্টে বোঝালুম।

সে বলল, 'ধর্মশাস্ত্রে যা নেই, তা জেনে আমার কি হবে?'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক কথা। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই কিন্তু ভ্রাতঃ তোমার পা যদি আজ আছাড় খেয়ে ভেঙে যায় আর ডাক্তার বলে, এল্লরে করে দেখতে হবে কোন্ জায়গায় ভেঙেছে, তখন কি ধর্মশাস্ত্রে এল্লরে-র কল বানাবার সন্ধান পাবে?'

উত্তরে কি বলেছিল মনে নেই। ধর্ম রক্ষা করবেন এই জাতীয় কিছু একটা। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখি পল পার্সি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। তত্ত্বালোচনা পার্সিকে বিকল করে সে-কথা পূর্বেরই বলেছি, কিন্তু এস্থলে পল পর্যন্ত বিচল হয়ে পড়লো। আমি যখন একটু থেমেছি তখন দেখি তারা এক দোকানীর সঙ্গে দরদস্তুর করছে।

কি ব্যাপার? মিশরের পিরামিডের ভিতর যে সব টুকিটাকি জিনিস পাওয়া গিয়েছে তারই কিছু কিছু এখানে বিক্রি হচ্ছে। আমি বললুম এ-সব তো মহামূল্যবান জিনিস গুলো কেনার কড়ি আমাদের কাছে আসবে কোথেকে, আর মিশরী সরকার সেগুলো জাদুঘরে সাজিয়ে না রেখে বাজারে বিক্রি করবার জন্য ছাড়বেই বা কেন?

দোকানী বললে 'একই জিনিস এত অসংখ্য পিরামিডে এত বেশী পাওয়া গিয়েছে যে সেগুলো সরকার বাজারে ছেড়েছে—ডালোগুলো অবশ্য জাদুঘরে সাজানো আছে এবং দামও তাই বেশী নয়।

আমি কিনি কিনছি কিনি কিনছি করছি, এমন সময় সেই আজহরের ছেলেটি আমার কানে কানে বললে, 'তাই যদি হবে তবে ওর দোকানের পিছনের কারখানাতে কি সব তৈরী হচ্ছে। চলুন না কারখানাটা দেখে আসবেন।'

আমি বললুম কি আর হবে দেখে? জার্মানিতে তৈরী কাশ্মীরী শাল, জাপানে তৈরী 'খাটি' 'অতিশয় খাটি' 'ভারতীয় খন্দর' কলকাতায় তৈরী জার্মান ওয়ুথ এসব তো বহু বার দেখা হয়ে গিয়েছে। ওর থেকে নতুন আর কি তত্ত্বলাভ হবে?

পল পার্সিকে বললুম 'পাশের ছেলের খাতা থেকে তুলি করা আর এই জাল মাল তৈরী করাতে তফাত নেই।

পল বললে, 'খাটীর ধরতে পারলে কান মলে দেন।'

আমি বললুম 'সরকারও মাঝে মাঝে এদের কান মলে দেয়।'

তখন হঠাৎ খোয়াল হল আজহরী ছেলেটি যে ফিসফিস করে কানে কানে কথা বলেছিল, সেটা বাঙলায়। তৎক্ষণাৎ তাকে শুধালুম 'আপনি কি বাঙালী?' সে বললে 'হী।'

তার পর শুনলুম বর্ধমানে বাড়ি, দশ বছর বয়সে এখানে সে এসেছে। বাঙলা প্রায় ভুলে গিয়েছে। আরো চার বছর অর্থাৎ সবসুদ্ধ বারো বছর এদেশে কাটিয়ে ফের বর্ধমানে ফিরে যাবে।

সেখানে ফিরে গিয়ে কি করবে? এই বিদ্যার কদর তো ভারতবর্ষে নেই? তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? কাশী থেকে বারো বছর সংস্কৃত শিখে বর্ধমানে ফিরলে তার পাণ্ডিত্যেরই বা মূল্য দেয় কে? তাকেও তো সেখানে উপোস করতে হয়। একেও তাই করতে হবে। আজ আর প্রাচীন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যকে কেউ সম্মান করে না।

কিন্তু ছেলেটির দেখলুম তাই নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই। ব্যাপ ধর্মিক লোক ছেলেকে ধর্মশিক্ষা করতে পাঠিয়েছেন, তাই শিখে সে দেশে ফিরে যাবে তারপর যা হবার তাই হবে।

দলের কেউ এ দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, কেউ ও দোকানের, সামনে

দাঁড়াচ্ছে। কেনাকাটা হচ্ছে অতি সামান্য। টুকিটাকি নাড়াচাড়াতে আনন্দ অনেক বেশী—স্বরণও তাতে নেই। এই করে আমরা সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম কিন্তু হঠাৎ দলের একজন স্বরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের পোটেন্সিদের ট্রেন ধরতে হবে আটটায়। আবুল আসফিয়াকে স্বরণ করিয়ে দিতে তিনি বললেন, 'চলুন।' কিন্তু তাঁর হাবভাবে কোনো ভাড়া নেই।

অতি অনিচ্ছায় ট্রামে উঠতে হল। আজহরের ছেলেটি আমার সঙ্গে বাঙলা কথা কইতে পেয়ে আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। সেও চললো আমাদের সঙ্গে। আরবী ভাষা এখন তার জীবনের মূলমন্ত্র, কিন্তু তাই বলে কি মাতৃভাষা বাঙলার মায়া এত সহজে কাটানো যায়?

ঘাচাঙ করে ট্রাম দাঁড়াল। ব্যাপার কি? আগের একটা ট্রাম মোড় নিতে গিয়ে লাইন থেকে ছিটকে পড়ছে। বাদ বাকী সব ট্রাম তার পিছনে গড়ডালিকায় দাঁড়িয়ে। লোহার ডাঙা দিয়ে জনকয়েক লোক ছিটকে পড়া ট্রামটাকে লাইনে ফেরত নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার চেয়ে চিংকার চোঁচামেচি হচ্ছে বেশী। লম্বা লম্বা আলখাল্লা উড়িয়ে রাস্তার ছেলে বুড়ো ট্রামটার চতুর্দিকে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আর কত প্রকারের না উপদেশ, আদেশ অনবরত ট্রামের ভিতর বাহির দুদিক থেকেই উপছে পড়ছে। দেশের হরির লুট এর কাছে লাগে কোথায়?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাটা রসিয়ে দেখছি, এমন সময় দলের একজনের হাশ হল আটটায় যে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। আমার দেহমন কিন্তু ঐ রণাঙ্গন থেকে তখন কিছুতেই সরছিল না। কারণ ইতিমধ্যে দেখি ট্রামটা কি পদ্ধতিতে ফের লাইনে তোলা যায় তাই নিয়ে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। যারা ডিপো থেকে এতক্ষণে এসে পৌঁচেছে তারা বাতলাচ্ছে এক প্রকারের রণকৌশল, আর সব কটা ট্রামের ডাইভার কন্ডাকটরের দল সে রণকৌশলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করছে অন্য জিহাদ। ব্যাপারটা তখন এমন চরমে পৌঁচেছে যে, উভয় পক্ষ তখন লোহার ডাঙা হাতে করে মুখোমুখি হয়ে সদম্ভে সর্গর্বে সর্বপ্রকারের আক্ষালন কর্ম সৃষ্টি পদ্ধতিতে শটনঃ শটনঃ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দুই দলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রামের যাত্রী এবং রাস্তার লোক। আর রাস্তার ছোঁড়ারা আলখাল্লা উড়িয়ে তাদের চতুর্দিকে পাই পাই করে ঘুরছে, বোঁ করে মধ্যস্থান দিয়ে ইস্পার উসপার হয়ে যাচ্ছে, ধরা পড়ে কখনো বা দু-একটা চড়-চাপড়ও খাচ্ছে।

একটা 'ফাস্টো কেলাস' লড়াইয়ের পূর্বরঙ্গ কিংবা পূর্বাভাস!

কিন্তু হায়, পৃথিবীর কত সংকর্মই না অসম্পূর্ণ রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নিধিরামকে একদিন মোকা-মাফিক আত্মসে উত্তম-মাধাম দেব, তার পূর্বেরই তো ম্যাটিক পাশ করে ইন্সুল ছাড়তে হল। আর নিধে রাস্কেলটা ফেল মেরে পড়ে রইল ইন্সুলে। কী অন্যায্য অবিচার! নিধেটা লেখাপড়ায় একটা আন্ত বিদ্যাসাগর, সে কথা জানি, কিন্তু আরো কত খাটিশও তো ম্যাটিক পাশ করে। ও করলেই বা কোন মহাতারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? আমিও তো দুটো কিল মারার সুযোগ পেতুম। এই সব অবিচার দেখে সংসারের প্রতি আমার তখন ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

আজও তাই হল। দলের লোকের তাড়ায়। তখন আর বেশী সময় হাতে নেই।  
ট্যাকসি নিতে হল।

বুকে আপিসের সামনে যাত্রার দলের হনুমানের নাজের মতো পাঁচ  
পাকানো কিউ-Q। কেউ কেউ ওটাকে U বলে বলে W ও বলে থাকেন, কারণ  
জায়গার অভাব থাকলে কিউ সচরাচর এই রকম শেপ-ই নিয়ে থাকে। অথচ  
গাড়ি ধারার সময় তখন মাত্র পাঁচ মিনিট। আবুল আসফিয়া কিউ এতে দাঁড়ালেন।  
আমি তাকে বললুম, 'ট্রেন মিস নিচ্ছো।' তিনি বললেন, 'আপনারা স্টেশনে যান।'

স্টেশনে কখন কোন প্রাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে তার খবর নিয়ে যখন সেই  
প্রাটফর্মের মুখে দাঁড়ালুম, তখন গেট-চেকার তাক্তা-তাক্তা ইংরেজীতে  
শোথালে,—

'আপনারা যাবেন কোথায়?'

'পোর্টসমুদ্র।' (সমবেত সঙ্গীত)

'তবে ট্রেনে গিয়ে আসন নিচ্ছেন না কেন?'

তাই শুনে পড়ি-মরি হয়ে এক দল দিল ছুট ট্রেনের দিকে, আরেক দল যাবে  
কি যাবে না এই ভাবে ন যাবে ন তত্বী হয়ে রইল দাড়িয়ে, নড়লুম না আমরা  
তিনজন, পল, পার্সি আর আমি।

পল বললে, 'আমাদের টিকিট এখনো কাটা হয় নি।'

চেকার ছোকরা বললে, 'আপনারা যান।'

মনে হল ছেলটি বুদ্ধিমান। আমাদের চেহারা-ছবি দেখে এচ্ছে, আমরা  
ফাকি দিয়ে গাড়ি চড়ার ভালে নই। আমরা যখন পরসা দেবার জন্য তৈরী তখন  
আমাদের ঠেকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মনে তখন যাব-যাব করছে। তখন পলের কথাতো বুঝলুম, সে কতখানি  
ভদ্র ছেলে! আমাকে বললে, 'আবুল আসফিয়াকে ছেড়ে আমরা যাবো না।'

সেই উৎকট সঙ্কটের সময়ও আমার মনে পড়ল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিশেষ  
অবস্থায় বসে যেতে রাজী হন নি।

আমাদের চোখের সামনে স্টেশনের বিরাট ঘড়ি। সেটা তখন দেখাচ্ছে, ৭.৫৯।

কলাপুসিবল গেটের ভিতর দিয়ে দেখছি, আমাদের ট্রেনের গার্ড বীরোচিত  
ধীর পদে টহল দিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ট্যাকঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

মিশর তো প্রাচ্য দেশ, আরামের দেশ, অনুপনকগুলিটির দেশ। ওরা আবার  
সময় মতো গাড়ি ছাড়ার যাবনিক পদ্ধতি শিখল কোথা থেকে? সংসারের  
অবিচারের প্রতি আবার আমার যেন্না ধরলে। ট্রেন তো বাবা, সর্বত্রই নিত্য নিত্য  
লেট যায়। এই যে সোনার মুহুর্ত ইংলন্ড, যার প্রশংসায় এ পোড়ার দেশের সবাই  
পঞ্চমুখ দশানন, সেই দেশ সম্বন্ধেই শুনেছি, এক ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন রোজ  
লেট যেত এবং বেচারী তাই নিয়ে অনেক আবেদন-ক্রন্দন করার পর একদিন  
সত্যি সত্যি কাটায় কাটায় ঠিক সময়ে ট্রেন স্টেশনে এল। লোকটি উল্লাসভরে  
স্টেশনমাষ্টারকে কনগাচুলেট করতে মাষ্টার বিমর্ষ বদলে রপুলে, এটা পল  
কালের ট্রেন, ঠিক চম্বিশ ঘন্টা গেট।'

সেই পরানের দাশ বিলেতেই যদি এই ব্যবস্থা তবে এই খানদানী

পেরেমভারী মিশরে মানুষ কি শুদ্ধমাত্র আমাদের দলকে ভাঙাবার জন্যই  
কটকে কটকে ট্রেন ছাড়তে চায়?

দেখি, গার্ড সাহেব দৌলুমান গতিতে আমাদের দিকে আসছে। চেকারকে  
কি যেন শুধালে তারপর উত্তর শুনে আমাকে বললে, 'আর তো সময় নেই,  
গাড়িতে উঠুন।'

লোকটির সৌজন্যে আমি সমোহিত হয়ে গেলুম। কে আমরা, আমাদের জন্য  
ওর অত দ্রুত কিসের? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমরা মার্কিন টুরিস্ট নই যে তাকে  
কাঁড়া-কাঁড়া সোনার মোহর টিপস দেব। মিশরের ট্রেন লোহালকড়ের বটে, কিন্তু  
মশরীফ গার্ডের দিল মন্থবতের বুনে তৈরী।

আমি পাগল-পারা বুজছি সৌজন্য ভদ্রতার আরবী, তুর্কী, ফার্সী বাবা, যা  
দিয়ে আমি তাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। ইথরিজিতে তো আছে  
শুধু ছাই 'খ্যাছু', ফরাসীতে 'মেরি, মেরি', জার্মানেও নাকি 'ডাকি' না 'ডাকি' কি  
যেন একটা আছে কিন্তু ঐ সামান্য একটা দুটো শব্দ দিয়ে গার্ড-সাহেবের  
সৌজন্য-সমুদ্রে আমার হাল পানি পাবে কেন?

তবুও তেরিয়া হয়ে বলে গেলুম 'আনা উশকুরুকুম' 'চোক তশকুর এদরং  
এফেন্দং' 'বৈলী তশকুর মিদমহাতন, কুরবান' আরো কত কী, উন্টা-সুন্টা।  
তার মোক্ষা অর্থ, 'মহাশয় যে সৌজন্য দেখাইলেন, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে  
যুগ-যুগান্তবার্ণী অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে কিন্তু হাসফিল আমরা লৌহ-  
বর্জশকটে আরোহণ করিতে অক্ষম যেহেতু আমাদের পরমমিত্র চরমসখা  
শ্রীশ্রীমান আবুল আসফিয়া নুরুউদ্দীন মুহম্মদ আব্দুল কাদিম সিদ্দীকীকে পরিত্যাগ  
করিয়া দেশান্তর গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

সঙ্গে সঙ্গে আরবী, তুর্কী, ফার্সী তিন ভাষাতেই বিস্তর ক্ষমা ভিক্ষা করলুম।

আর মনে মনে মোক্ষম চট্টি আবুল আসফিয়ার উপর। লোকটার কি কণামাত্র  
কাভজ্ঞান নেই? দলের নেতা হয়ে কোনো রকম দায়িত্ব বোধ নেই? সাথে কি  
ভারতবর্ষ স্বরাজ্য থেকে বঞ্চিত।

হঠাৎ পল পার্সি দিল ছুট। তারা আবুল আসফিয়াকে দেখতে পেয়েছে। এবং  
আশ্চর্য, লোকটা তখনো নিশ্চিন্ত মনে রেলের এক কর্মচারীকে স্টেশনের বড়  
ঘড়িটা দেখিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছে। বোঝাচ্ছে কী! নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে, ওদের ঘড়ি  
ফাস্ট যাচ্ছে। তা যাচ্ছে তো যাচ্ছে, সে কথা বুঝিয়ে কি তোমার টাকেতে চুল  
গজাবে—ওদিকে ট্রেন মিস করে?

কথার মাঝখানেই পল আর পার্সি পিছন থেকে তাকে দুহাতে ধরে দিলে  
হ্যাঁচকা টান। তার পর দিল ছুট গাড়ির দিকে। আমিও পড়ি-মরি হয়ে সেদিকে।  
দলের যারা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও জয়োহাসে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে।  
আবুল আসফিয়া হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। স্টেশনের আন্তর্জাতিক জনতা যে  
যার পথ ভুলে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। পুলিশ দিয়েছে হাইস্ক। তবে কি  
দিনেদুপুরে কিডন্যাপিং! কিন্তু এ তো,

'উন্টা বুঝলি রাম, ওরে উন্টা বুঝলি রাম,

কারে করলি ঘোড়া, আর কার মুখে লগাম?'

এখানে তো বুড়ো-ধাড়িকে পাকড়ে নিয়ে চলেছে দুটো চ্যাংড়া।



গাড়ি ঠিক সময়ে ছেড়েছিল না লেটে, আবুল আসফিয়ার ঘড়ি ঠিক না রেলের ঘড়ি ঠিক এসব সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান হল না। গার্ড সায়েব যে ভাবে পিছন থেকে পাকা হাতে আমাদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গাড়িতে ওঠালে তার থেকে অনুমান করলুম, এ প্রকারের কর্ম করে করে তার হাত ঝানু হয়ে গিয়েছে।

আবুল আসফিয়া তখনো পলকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তাঁর ঐ ঘড়িটা ই সুইজারল্যান্ডের ক্রনোমিটার পরীক্ষায় পয়লা প্রাইজ পেয়েছিল। মিশরীদের সময়-জ্ঞান নেই। আমরাও অতিশয় সরল। চিলে কান নিয়ে গেল শুনেই—

২৩

আহা! সুন্দর দেশ!

খালে নালায় ভর্তি। গাড়ি মিনিটে মিনিটে গম্, গড়ম গড়ম্ করে সে সব নালায় উপর দিয়ে পেরুচ্ছে। তারপর গাড়ি বলে 'বড়ঠাকুরপো'—'ছোটঠাকুরপো', 'বড়ঠাকুরপো'—'ছোটঠাকুরপো', তারপর ফের নালায় উপর 'গম', 'গড়ম' 'গড়ম'। আর গাড়ির শব্দ যে এত মিষ্টি কে জানতো? এ টেন মিস করলে আর দেখতে হত না।

খাল নালা তো বললুম, কিন্তু এক একটা নদ নদী এমনই চওড়া যে বোধ করি সেগুলো নীলেরই শাখা-প্রশাখা। আর সেগুলোতে জলে-ভাঙার মাঝখানে ফাঁক প্রায় নেই। নিত্যন্ত বর্ষাকাল ছাড়া আমাদের নদীর জল যান তলিয়ে আর পাড়গুলো থাকেন খাড়া হয়ে। সে জল অতি নিচু থেকে উপরে তোলা যায় না বলে সে জল থেকেও নেই। চাষী তাই দিয়ে শীতকালে আরেকটা ফসল তুলতে পারে না। এদেশের লোক সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে চাষবাস শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একমাত্র নদী নীলের গা থেকে হাজার হাজার খাল নালা কেটে রেখেছিল যে সে নদী গভীর হবার সুযোগ পায়নি এবং ফলে নীলের জল দেশটাকে বারো মাস টেটবুর করে রাখে।

খেতভরা খান গম কার্পাস! সবুজে সবুজে ছলছল। মাঝে মাঝে খেজুরগাছের সারি, আর কখনো বা এখানে একটা সেখানে একটা, দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেতের পাহারা দিচ্ছে।

আর নদীর উপর দিয়ে চলেছে উঁচু উঁচু তোকোণা পাল তুলে দিয়ে লম্বা লম্বা নৌকো। এ দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না বলে নৌকোতে ছইয়ের ব্যবস্থা প্রায় নেই। জোর হাওয়ায় নৌকোগুলো চলেছে দ্রুতগতিতে। পালের দড়ি ছিঁড়ে গেলে নৌকো যে ডুবে যাবে সে ভরভর এদের নেই। তবে বোধ করি এদেশে দমকা হাওয়া হঠাৎ এসে নৌকোকে এলোপাতাড়ি ধাক্কা লাগায় না।

সবুজ ক্ষেত, নানারঙের পাল, ঘোর ঘন নীল আকাশ, চলচল ছলছল জল মনটাকে গভীর শান্তি আর পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে দেয়। গাড়ির জানালার উপরে মুখ রেখে আধ-বোজা চোখে সে সৌন্দর্যরস পান করছি, আর ভাবছি, এই সৌন্দর্য দেখার জন্যেই তো বহুলোক রেলগাড়ি চড়ে, আমি যদি এদেশে থাকবার সুযোগ পেতুম! তবে প্রতি শনিবারে রেল চড়ে যে দিকে খুশী চলে যেতুম। কিছু না, শুধু নৌকো, জল খেত আর আকাশ দেখে দেখে দিনরাত কাটিয়ে দিতুম।

রাতের কথায় মনে পড়ল, চাঁদের আলোতে এ সৌন্দর্য নেবে অন্য এক ভিন্ন রূপ। সেটা দেখবার সুযোগ হল না—এখানটায়, এবারে।

মাঝে মাঝে নদী, নৌকো, খেজুরগাছ সব-কিছু ছাড়িয়ে দেখতে পাই সেই তিনটে বিরাট পিরামিড। কত দূরে চলে এসেছি তবু তারা মাঝে মাঝে মুখ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে আবার কাছের গাছের পিছনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার মুখ দেখাচ্ছে। তখনই বুঝতে পারলুম, পিরামিডগুলো কত উঁচু। কাছের থেকে যেটা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি।

কম্পার্টমেন্টের মাঝখানে দিয়ে চলাফেরার পথ—কলকাতার টাম গাড়িতে যে রকম। সেই পথ দিয়ে যে কত রকমের ফেরিওয়ালা এল গেল তার হিসেব রাখা ভার। কমলালেবু, কলা, রুটি থেকে আরম্ভ করে নোটবুক চিরকনি, মোজা, ঘড়ি, লটারির টিকিট হেন বস্তু নেই যা ফেরিওয়ালা দুচার বার না দেখালে—মনে হল লোহার সিন্দুক এবং আস্ত মোটর গাড়ি মাত্র এই দুই বস্তুই বোধ করি ফেরি করা হল না।

এক কোণে দেখি জাম্বা-জোম্বা-পর্য এক মৌলানা সায়েব হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁকে ঘিরে বসেছে এক গাল ছোকরা—তারাপ পরোছে জাম্বা-জোম্বা, তাদের মাথায়ও লাল ফেজ টুপিতে প্যাচানো পাগড়ি। দু-চারজন সাধারণ যাত্রীও দলে ভিড়ে বক্তৃতা শুনছে। পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম, ইনি আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছুটিছাটায় যখন গ্রামের বাড়ি যান তখন তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গেই বাড়ি যায়। সমস্তক্ষণ চলে জ্ঞানচর্চা। টেনের অন্য লোকও সে শাস্ত্রচর্চা কান পেতে শোনে।

উত্তম ব্যবস্থা। প্রাচীন যুগে গুরুগৃহে বাস এবং বর্তমান যুগের কলেজে গিয়ে পড়াশুনা করা দুটোর উত্তম সমন্বয়। মাঝখানে থার্ড ক্লাস গাড়ির প্যাসেঞ্জার, চাষাভূষীরাও এদের জ্ঞানের কিছুটা পেয়ে গেল। আমাদের দেশের চাষারা তো প্রফেসরদের জ্ঞানের একরঙিও পায় না।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওয়ার কাছ থেকে কলামুলো কিনে নিয়ে মৌলানা সায়েব যাচ্ছেন, ছেলেদেরও খাওয়াচ্ছেন। সেও পরিপাটি ব্যবস্থা।

হরেক রকম ফেরিওয়ালাই তো গেল। এখন এলেন আরেক মূর্তি। মুখে এক গাল হাসি—আপন মনেই হাসছে—পরনে লজবুড় কোট—পাতলুন, নোজা শার্ট, টাইয়ের 'নটটা' টারোচা হয়ে কলারের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, আর হাতে এক তাড়া রঙিন ছবিতো ভর্তি হ্যান্ডবিল—প্যামফ্লেট।

কেন যে আমাকেই বেছে নিলে বলতে পারবো না। বোধ হয় আমাকেই সব চেয়ে বেশী বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। ফেরিওয়ারা বোঁকাকেই সঙ্কলের পয়লা পাকড়াও করে এতো জানা কথা। এক গাল হাসির উপর আরেক পোঁচ মুচকি হাসি লেপটে দিয়ে শুধালে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে স্যার?'

ইয়োরোপীয় জাহাজ চড়ে মেজাজ খানিকটে বিলিভি রং ধরে ফেলেছে; বলতে যাচ্ছিলুম, তোমার তাতে কি? কিন্তু মনে পড়ল, মিশর প্রাচ্য দেশ, এ প্রশ্ন শুধানে অতদূর কিংবা অনধিকার প্রবেশ নয়। বললুম, 'পোর্টসাইদ।'

'তার পর?'

মোগলাই মেজাজ চেপে নিয়ে বাঙালী কণ্ঠে বললুম, 'ইয়োরোপ।'



'ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু ইয়োরোপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, তার আগে এই মিশরের পাশের দেশ প্যালেস্টাইনটা ঘুরে আসুন না।' আমি তো একেবারে থা। হরেকরকমের ফেরিওলা তো দেখলুম। কেউ বিক্রি করেছে চপয়সার জুতোর ফিতে, কেউ বিক্রি করে পাঁচশ' টাকার সোনার ঘড়ি কিন্তু একটা আস্ত দেশ বিক্রির জন্য তার আড়কাঠি টেনের ভিতর ঘোরাঘুরি করবে, এ-ও কি কখনো বিশ্বাস করা যায়? তবু ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেবার জন্য শুধালুম, 'আপনি বুঝি দেশ বিক্রি করেন?'

সে আমার কোনো কথাই উত্তর না দিয়ে আরেক গাল হেসে তার হাতের তাড়ার ভিতর থেকে কি একটা খুঁজতে আরম্ভ করলো। ইতিমধ্যে আমার পাশের তদ্রলোক তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সে খুঁপ করে বসে পড়ে তার হাতের ডাই থেকে বের করলে প্যালেস্টাইনের হরেক রকম ছবিওলা রঙচঙা প্যামফ্লেট তার উপর দেখি মোটা মোটা অক্ষরে লেখা প্যালেস্টাইন 'palestine, the land of the lord' 'প্রভুর জন্মভূমি', ইত্যাদি আরো কত কী! তারপর বললে, 'দেশ বিক্রি করি? হ্যাঁ তাই বটে, তবে কিনা যে ভাবে ধরেছেন, ঠিক সে ভাবে নয়। কিন্তু সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখুন তো, কী চমৎকার দেশে আপনাকে যেতে বলেছি যে- দেশে প্রভু জীসাস্ ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি নিচয় প্রভুর—'

আমার ভাবি বিরক্তি বোধ হলো। এসব লোক কি ভাবে? ভারত-বর্ষের লোক যীশুর নাম শোনে নি? তেড়ে বললুম, 'The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat'—ইত্যাদি ইত্যাদি,—চড়চড় করে মথি লিখিত সুসমাচার থেকে মুখস্থ বলে যেতে লাগলুম, প্রভু যীশুর ঠিকুজি কুলাজি। লোকটা কিন্তু একদম না দমে গিয়ে বললে, 'ঠিক, ঠিক। এই দেখুন সেই জায়গা যেখানে প্রভু জন্ম নিলেন। একটা সরাইয়ের আন্তাবলে মা মেরি আর তাঁর বর যোসেফ তখন প্যালেস্টাইন থেকে এই মিশরের দিকে পালিয়ে আসছিলেন। বেৎলেহেম গ্রামে সন্ধ্যা হল। সরাইয়ে জায়গা না পেয়ে মা-মেরি আশ্রয় নিলেন আন্তাবলে। এই দেখুন সেই আন্তাবলের ছবি। কত চিত্রকরই না এ ছবি ঐকিছেন। কত যুগ ধরে। তার পর দেখুন, নাজারেথ গ্রামের ছবি। যোসেফ সেখানে ছুতোরের কাজ করতেন, আর মা মেরি যেতেন জল আনতে। এই দেখুন—'

আমি বললুম 'বাস, বাস, হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার মুশকিলটা আদপেই বুঝতে পারেননি। আমি যদি পোর্টসমিথ থেকে 'প্রভুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনে' চলে যাই তবে সেখানে ফিরে এসে ইয়োরোপে যাবার জন্য আমাকে নতুন করে জাহাজের টিকিট কাটতে হবে তার পয়সা দেবে কে?—না হয় প্যালেস্টাইন তীর্থ-দর্শন-খরচা আমি কোনো গতিকে, কে'দে কোকিয়ে সামলে নিলুম। এক জাহাজের টিকিট একই জায়গা যাবার জন্য দু-দুবার কাটাবার মতো পয়সা কিন্তু আমার নেই।'

আড়কাঠি তো হেসেই কুটিকুটি। আমি বিরক্ত। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'জাহাজের ডবল ডাড়া লাগবে কেন? আপনি যে জাহাজে করে পোর্টসমিথে এসেছেন সেই কোম্পানিরই আরেকখানা জাহাজ পনেরো দিন পর সেখানে এসে ইয়োরোপ যাবে। আপনি সে জাহাজে গেলেন কিংবা এ জাহাজে

গেলেন তাতে কোম্পানির কি ক্ষতি-বৃদ্ধি? ডবল পয়সা নিতে যাবে কেন? আর ঐ পনেরো দিনে আপনি দেখে নেবেন প্যালেস্টাইন।'

আমি বললুম, 'হঁ, হঁ-উ-উ-কিন্তু সে জাহাজে যদি সীট না থাকে?'

লোকটার ধৈর্যও অসীম। সর্বমুখে বুদ্ধদেবের মতো করণার হাসি হেসে বললে, 'কে বলবে থাকবে না? এখন তো অফ সীজন্, ব্ল্যাক পিয়েরিয়েড, অর্থাৎ যাত্রীর ভিড় নেই। আপনি যে জাহাজে এলেন তার কি অর্ধেকখানা ফাঁকা ছিল না। আসছে জাহাজ গড়ের মাঠ।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। চিন্তাশীল লোক বলে নয় আসলে সব কিছু বুঝতেই আর পাঁচজনের তুলনায় আমার একটু বেশী সময় লাগে। রেন-বাল্লে আগাতালা রিসিডিং সেট' দিয়েছেন অতিশয় নিকট পর্যায়ের। বালুবণ্ডলো গরম হতে লাগে মিনিট তিন। তার পরও চিস্তির। তিনটে স্টেশন গুবলেট পাকিয়ে দেয় শুধু কড়া শিখ। কিছু বুঝতে পারি নে।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন এল। জানো বোধ হয়, অগা বোকারা মাঝে মাঝে, অর্থাৎ বছরে দু-একবার, পাকা স্যানার মতো দু-একটা প্রশ্ন ওঠাতে পারে। তাই শুধালুম, 'কিন্তু আমি প্যালেস্টাইন গেলে তোমার টাকে কি চুল গজাবে? তোমার তাতে কি লাভ?'

লোকটা এইবারে একটু বিরক্ত হল। প্রশ্নটা মোক্ষম কঠিন বলে, না 'টাক টাক' করলুম বলে ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমার মগজ তখন ঐ একটা কঠিন প্রশ্ন শুধাবার ধকল কাটাতে গিয়ে হ'পাতে আরম্ভ করছে।

বললে, 'আমার কি লাভ? আমার লাভ বিস্তার না হলেও অল্প। অর্থাৎ অল্প-বিস্তার। বুঝিয়ে বলি। আপনাকে নিয়ে যাবে কুকের আপিসে। তাদের কাছ থেকে কাটবেন আপনার পয়সা গন্তব্যস্থল, প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের টিকিট। নায়া বাড়াই দেবেন। কিন্তু কুক আমাকে দেবে কমিশন—'

আমি শুধালুম, 'কুক তোমাকে কমিশন নিতে যাবে কেন?' আমার বুদ্ধির 'প্রার্থব' দেখে লোকটা প্রায় হতাশ হয়ে বললে, প্যালেস্টাইন সরকার কুককে পয়সা দেয়, তার দেশে টুরিস্ট নিয়ে যাবার জন্য—তাতে করে সরকারের দুপয়সা লাভ হয়। তাই তারা কুককে দেয় কমিশন, কুক তার-ই খানিকটে দেয় আমাকে। তারা তো আর টেনে টেনে খন্ডেরের সন্ধানে টো-টো করতে পারে না। এ কর্মটি করি আমি। তাই আমার হয় কিঞ্চৎ মুনাফা বুঝলেন তো?'

পাছে লোকটা আমাকে ফের বোকা বানিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুকেছি, বিলক্ষণ বুকেছি।' যদিও আমি ততখানি সংসারী বুদ্ধি ধরি নে বলে ঐসব কমিশন-কমিশনের মারপাট আদপেই ধরতে পারিনি।

কিন্তু লক্ষ্য করলুম সে প্যাটপ্যাট করে আমার হাও-ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার উপরে মোটা মোটা হরফে লেখা ছিল—A.I.I, লোকটা শুধালে, 'ব্যাগটা আপনার?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'বাঃ! তা হলে তো আপনি মুসলমান। আর জেরুজালেম মুসলমানদের তীর্থ ভূমি-মস্কার পরেই তার স্থান। আগাতালা মুহম্মদ সাহেবকে রাতে আরব থেকে

জেরুজালেমে এনে সেখান থেকে স্বর্গদর্শনে নিয়ে যান। জেরুজালেমের সে জায়গাটার উপর এখন মুসজিদ-উলআকসা। বিরাট সে মসজিদ, অদ্ভুত তার গঠন। এই কিছুদিন হল আপনাদের দেশেরই রাজা হাইদাবাদের নিজাম সেটাকে দশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেরামত করে দিয়েছেন। দেখতে যাবেন না সেটা?

তারপর বললে, 'আসলে কি জানেন? আসলে জেরুজালেম হল ধর্মের ত্রিবেণী। ইহুদী, খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম এখানে এসে মিলেছে। এক টিগে তিন পানি।'

তীব্র দেখলে পুণ্য হয়, কি না হয় সে কথা আমি কখনো ভালো করে ভেবে দেখি নি। কিন্তু হিন্দুদের কানী, বৌদ্ধদের রাজগীর যখন দেখেছি, তখন এ-তিনটেই বা বাদ যাবে কেন? বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমি আদপেই পছন্দ করিনে। তাকেই বলে কমুনা-মিল্লম। সৃষ্টিকর্তা যখন তার অসীম করুণায় এতগুলো ধর্ম বানিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই সব-কটাতেই কিছু-না-কিছু আছে। আর বিশেষ করে মা তারি খুশী হবে, যখন শুনবে আমি বয়ৎ-উল-মুকদ্দস ('পুণ্যভূমি' অর্থাৎ জেরুজালেম) দর্শন করেছি। তারি যাবাত মক্কা অবধি পৌছতে পেরেছিলেন—বয়ৎ উল-মুকদ্দস দেখেন নি। সেখানে শুনেছি, অতি উত্তম তসবী (জপমালা) পাওয়া যায়। এক গাছ কিনে দিলে মা যা খুশী হবে। সাত রকম নামাজ পড়ার সময় (মুসলমানরা সচারচার পড়ে পাঠ রকম—মা পড়ে সাত) মা তসবী শুনবে, আর আমার উপর তারি খুশী হবে।

পল আর পার্সি অবশ্য কতন্ত দুঃখিত হল। পার্সি বললে, আমাদের ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন প্যালেস্টাইন? আপনি না বলেছিলেন, ভূমধ্য-সাগরের নানা জিনিস খুটিয়ে খুটিয়ে দেখাবেন, ইটালি আর সিসিলি, তারপর কর্সিকা আর সার্ডিনিয়ার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবার সময়, তিসুভিয়াস, আরো কত কী দেখাবেন?

আর্মি স্বাক্ষর, পাখণ্ড। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলুম। তবু হাতজোর করে মাপ চাইলুম।

পল পার্সির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছিঃ, পার্সি! স্যার ধর্মের জায়গা দেখতে তারি ভালোবাসেন। এসুযোগ ছাড়বেন কেন?'

তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এক দিকে বকুলন, আরেক দিকে মাযের তসবী।

নংসার কি শুধু ধন্দুতেই ভরা?

#### পরিশিষ্ট

প্যালেস্টাইন ভ্রমণ যে এ পুস্তকের অংশ হতে পারতো না তা নয়। কিন্তু পল আর পার্সি সঙ্গে না থাকলে সে বই তোমাদের বয়সী ছেলে-মেয়েদের কাছে ভাল লাগবে না বলে আমার বিশ্বাস। সে-বই হয়ে যাবে নিতান্তই বয়সীদের জন্য।

মানুষ বই লিখে বন্ধুজনকে উৎসর্গ করে আমি প্যালেস্টাইন সয়ক্কে না-লেখা ভ্রমণ কাহিনী উৎসর্গ করলুম মিত্রদ্বয় পল এবং পার্সিকে।